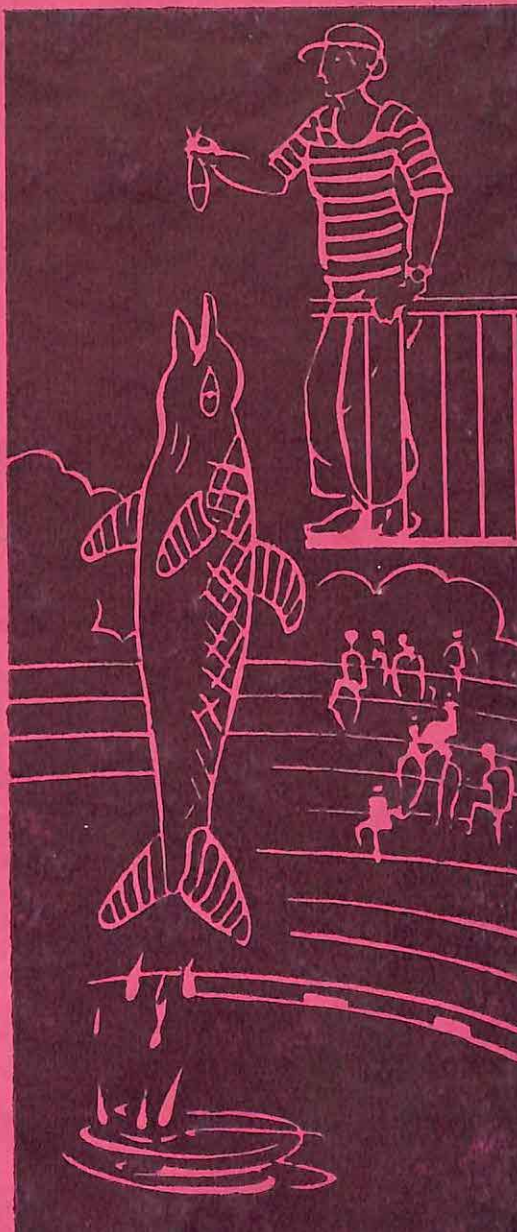
বিজ্ঞান নিয়ে গল্প

তপন চক্রবর্তী









বিজ্ঞান নিয়ে গল্প

তপন চক্রবর্তী

মুক্তধারা

"বাংলাদেশ লেখক ইউনিয়নের অনুরোধে বি. সি. আই. সি.-র খুলনা নিউজপ্রিণ্ট মিলে উৎপাদিত হ্রাসকৃত মূল্যের 'লেখক' কাগজে মুদ্রিত।"

মুক্তধারা ১১২৯

প্রকাশক ঃ
চিত্তরঞ্জন সাহা
মুক্তধারা
[স্বঃ পুথিঘর লিঃ]
৭৪ ফরাশগঞ্জ
ঢাকা ১১০০ বাংলাদেশ
প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭
প্রচ্ছদ-শিল্পী ঃ গোলাম সারোয়ার
মুদ্রাকর ঃ
ওবায়দুল ইসলাম
ব্যবস্থাপক বাংলা একাডেমী প্রেস ঢাকা
বাংলাদেশ
মূল্য ঃ সাদা ঃ ৩০·০০ টাকা
লেখক কাগজ ঃ ২০·০০ টাকা

BIGGAN NIYE GALPA
[Juvenile Stories on Science]
By Tapan Chakraborty
First Edition : February 1987
Cover Design : Golam Sarowar
Publisher: C. R. Saha
MUKTADHARA
[Prop. Puthighar Ltd.]
74 Farashganj
Dhaka 1100 Bangladesh
Price : Whiteprint : Taka 30·00
Lekhakprint : Taka 20·00

উৎসর্গ

মলিনা চক্রবর্তী

লেখকের বিজ্ঞানবিষয়ক জনপ্রিয় অন্যান্য বই

বৈজ্ঞানিক জগদীশচন্দ্র (৪র্থ সং)
মানুষের জন্য বিজ্ঞান (২য় সং) (প্রবন্ধ সংকলন)
কোথা থেকে কেমন করে এলাম
এসো বিজ্ঞান পড়ি
দাও ফিরে সে অরণ্য (প্রবন্ধ সংকলন)
সত্যেন্দ্রনাথ বসু (সম্পাদনা)
বিলুপ্ত ও বিলুপ্ত-প্রায় প্রাণী
মুহাম্মদ কুদরত-এ-খুদা
জীবকোষ (অনুবাদ)
প্রাণিবিজ্ঞান পরিভাষা
আইনস্টাইন (সম্পাদনা)

* এছাড়া স্কুল ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য বহু গ্রন্থ-প্রণেতা।
* ১৯৭৮ সালে গবেষণা গ্রন্থের জন্য ব্যাংক-সাহিত্য পুরস্কার প্রাপ্ত।
* বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান পত্রিকার নির্বাহী সম্পাদক হিসাবে বিজ্ঞান পত্রিকার ৩৮ খণ্ডের সম্পাদক।

ভূমিকা

বিজ্ঞান নিয়ে গল্প। ছোটদের জন্য লেখা বিজ্ঞানের কয়টি গল্প। ছোটদের জন্য লেখা দুরূহ কাজ। আমার পক্ষে এ কাজ সহজ নয়। তবু আগুনে হাত দেওয়া কেনো? জবাব দেওয়া কঠিন। ছোটদের জন্য ভালোবাসাই হয়তো আমাকে দুঃসাহসী করেছে। বিজ্ঞান লেখার ক্ষেত্রে এমনতরো দুঃসাহস দেখানোর প্রয়োজন আজ বড়ো বেশি করে দেখা দিয়েছে। বিজ্ঞানের বিপুল উৎকর্ষের যুগে আমরা কোন্ তিমিরে আছি সবাইকে ভেবে দেখার অনুরোধ জানাই।

গ্রন্থের গল্পগুলো 'ধান শালিকের দেশ', 'শিশু' ও 'নবারুণে' পত্রস্থ হয়েছিলো। এসব পত্রিকার সম্পাদকের কাছে আমি ঋণী। গ্রন্থ-উপযোগী গল্প বাছাই করে দিয়েছেন বন্ধু কবি, প্রাবন্ধিক ও বিজ্ঞান-লেখক শ্রীসুব্রত বড়ুয়া। তাঁর সাথে আমার শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সম্পর্ক। তারপর ঋণ তো চিত্তদার কাছে আছেই। চিত্তদা মানে গ্রন্থের প্রকাশক শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা।

ছোটরা এই বই পড়ে বিজ্ঞান পড়তে ও লিখতে এবং বিজ্ঞান নিয়ে ভাবতে আগ্রহী হলে আমি ছোটদের জন্য বিজ্ঞান লিখতে আরো দুঃসাহসী হবার চেষ্টা করবো।

তপন চক্রবর্তী
৮৪, সেন্ট্রাল রোড

অমর একুশে, ১৯৮৭

আজব কল

আমাদের দেহ একটি আজব কল। কলটির গড়ন এমন নিখুঁত যে এর কথা ভাবতেই অবাক লাগে। কলের প্রতিটি অংশ মাপে মাপে বানানো। একটুও কমবেশী নেই। আজব কলটিকে ঠিক-ঠাক চালাবার জন্যে প্রতিটি অংশ নিজ নিজ কাজ করে চলে। কাউকে কিছু বলতে হয় না। কার কি কাজ সে অমনিই বুঝে নিচ্ছে। আমাদের বোঝার আগেই কখন যে কি হয়ে যায়। চোখের দিকে সাঁই করে একটি মাছি উড়ে এলো। অমনি চোখের পাতা গেলো বন্ধ হয়ে। সিগারেটের টুকরোর উপর অসাবধানে পা পড়লো। আচমকা তিড়িং করে পা উপরে উঠে গেলো। পায়ে কাঁটা বেঁধার সাথে সাথে "ওঃ মাগো" করে কাতড়ালে। সারা শরীর জেনে গেলো কি একটা পায়ে বিঁধলো বলে।

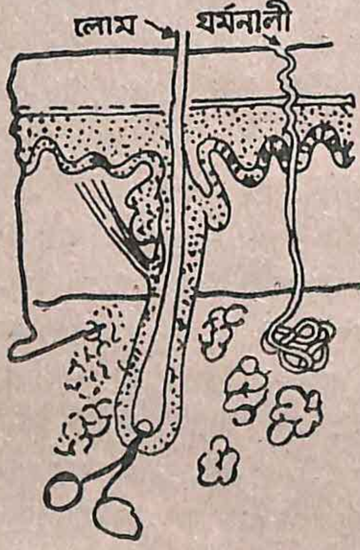
এ ছাড়া ধরো, খিদে পেলো। খেতে বসলো। খেতে খেতে এক সময় জেনে গেলে, আর না। পেট ভরে গেছে। তুমি-আপনা-আপনিই বুঝে ফেললে। পাকস্থলি তো হাঁক মেরে বললো না, "ওহে আর খেতে নেই।" তারপর? তারপর খাবার হজম হলো, দেহ বল পেলো আর খাবারের অভুক্ত অংশ মল হয়ে বেরিয়ে গেলো। মল এমনিতে তো বেরোয় না। বেরোনোর আগে জানিয়ে দেয়। এসব আপনা-আপনিই হচ্ছে। কি করে হচ্ছে জানি না। কে করে তাও জানি না। তবে হচ্ছে এই যা।

দেহের মোড়ক : চামড়া

শরীরের উপর দিয়ে পিঁপড়া হেঁটে গেলে টের পাই। গরম, ঠাণ্ডা হাওয়া বুঝতে পারি। কেউ ছুঁলেই জানতে পাই। কি

২—

করে, কি দিয়ে ? চামড়া দিয়ে নয় কি ? হ্যাঁ, চামড়া দিয়ে তো বটেই। কি করে পাই ? চামড়ায় অসংখ্য স্নায়ু থাকে। স্নায়ু সব খবর নিয়ে যায়, দিয়ে যায়। চামড়ার উপরে রয়েছে অসংখ্য লোম। লোমের গোড়ায় থাকে স্নায়ু-প্রান্ত। লোম স্পর্শ করলেই লোমের গোড়া নড়ে উঠে। গোড়ার স্নায়ু তখুনি কাজ শুরু করে। দেহের বাইরে-ভিতরে তাপ চলাচল করছে চামড়া দিয়েই। তাহলে ঠাণ্ডা গরম চামড়া দিয়েই তো বোঝা যাবে।



চামড়ায় অনেক ভাঁজ

চামড়ায় আর কি আছে? আছে অনেক জিনিস। খুব দরকারী জিনিসের মধ্যে রয়েছে ঘর্মনালী ও সূক্ষ্ম রক্তনালী। ঘর্মনালী শরীরে দূষিত পদার্থকে ঘামের সাথে বের করে দেয়। চামড়ার এই-ই কি শুধু কাজ? তা হবে কেন।

চামড়ার প্রধান কাজ দেহকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করা। ঝড়-ঝাপটা প্রথমে চামড়ার উপর দিয়েই যায়। চামড়ার সহ্য-ক্ষমতাও বেশি। সহ্য-ক্ষমতা না থাকলে ভিতরের অঙ্গগুলির অবস্থা কাহিল হবে না? চামড়া সব অঙ্গের উপরে মোড়কের মতো জড়িয়ে থাকে। মোড়কটি ফেটে গেলে, ছিঁড়ে গেলে কি অবস্থা হবে বল তো। তাই, লক্ষ্য রাখতে হয়, অযথা যেন এতে চোট না লাগে। ছড়ে বা ছিঁড়ে না যায়।

আগেই বলেছি চামড়ার ঘর্মনালীর কথা। ঘাম লোমকূপ দিয়ে বেরোয়। লোমকূপ মানে ঘর্মনালীর মুখ। লোমের গোড়ায় এই কূপগুলি থাকে। ছবিতে লোমকূপ একটু দূরে দেখা যাচ্ছে কারণ এটিকে অনেক বড় করে দেখানো হয়েছে। লোমকূপ বন্ধ হয়ে গেলে সর্বনাশ। কি হবে? ঘাম বেরোবে না। ঘাম বের না হলে শরীরের দূষিত পদার্থ বেরুবে না। শরীরে রোগ জন্মাবে। লোমকূপ বন্ধ হয় কি করে? ময়লা জমে। প্রতিদিন চামড়া পরিষ্কার করতে হয়! নইলে ময়লা জমবেই। ময়লা আর ঘাম মিলে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়। এরকম হলে সবাই নাক সিটকাবে না? চামড়ায় ময়লা জমলে খোস-পাঁচড়া, একজিমা, নানা ধরনের চুলকানি হতে পারে। আর পরিষ্কার ও সুস্থ থাকলে চামড়া সতেজ থাকে। মনটাও থাকে ফুরফুরে।

দেহের মোড়ল ঃ পেশী

লাফ দাও, ঝাঁপ দাও, ডিগবাজী খাও, শরীরকে যাচ্ছেতাই বাঁকাও। যেই সেই। খাড়া শরীর খাড়াই। এসব হচ্ছে পেশীর গুণে। চামড়ার নিচে থাকে এক স্তর চর্বি। চর্বির নিচেই পেশী।

পেশী, পেশী, পেশী। প্রায় সব অঙ্গই তো পেশী দিয়ে গড়া। বয়স্ক মানুষের হাড়ের ওজনের চেয়ে পেশীর ওজন আড়াই



পেশী দেখায় কেমন

গুণ বেশী। পেশীকে আমরা মাংস বলি। আমাদের দেহকে নাদুস-নুদুস দেখায় পেশীর জন্যেই।

সারা দেহে পেশীর সংখ্যা অসংখ্য। এর কতগুলি আমাদের ইচ্ছায় চলে আর কতগুলি চলে ওদের মর্জিমাফিক। হাড়ের

উপর যে সব পেশী থাকে তারা আমাদের আদেশ মানে। হাত, পা, ঘাড়ের পেশী আমাদের কথামতো চলে।

বলেছিলাম পাকস্থলীর কথা! পাকস্থলী, যকৃৎ, হৃৎপিণ্ড, অগ্ন্যাশয়, বৃক্ক, প্লীহা, ক্ষুদ্রান্ত্র, বৃহদান্ত্র, শুক্রাশয়, শিরা, ধমনী, মস্তিষ্ক ইত্যাদির পেশী আমাদের কথামতো চলে কি? মোটেই না। ওরা যার যার কাজ সে সে করে যায়। তবে পেশীদের মধ্যে একটা শৃঙখলা আছে। নইলে গণ্ডগোল বাঁধতো। দেহের সামান্য একটু নড়াচড়ায় শত শত পেশী আপনা-আপনি নিয়ম মেনে কাজ করে যায়।

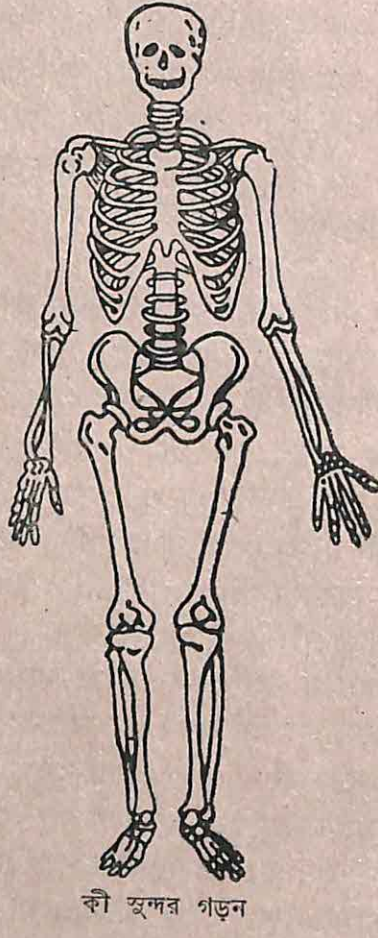
দেহের জোড়া বা সন্ধির কাছের পেশীগুলির কাজ বেশী। হাঁটু, কনুই, কব্জির কতো বেশি কাজ দেখ। সারাদিনই একবার ছোট হওয়া, আবার বড় হওয়ার কাজ লেগেই আছে।

দেখা গেছে, যারা শরীর খুব খাটায়, তাদের পেশী খুব শক্ত ও লম্বা হয়। যাদের পেশী খুব শক্ত তারা খুব পরিশ্রম করতে পারে। পরিশ্রমী লোক খেতে পারে বেশি। এদের হজম শক্তিও বেশি। এসব লোক বেশিদিন বাঁচে। এদের শরীরে রোগ বাসা বাঁধতে পারে না। এরা সুস্থ থাকে।

যারা শরীরকে খাটায় না, তাদের পেশী নরম ও খাটো হয়। নরম পেশী কোনো কাজের নয়। এদের চেহারায় শরীরে কোন বাঁধন-ছাদন থাকে না। শুধু নাদুস-নুদুস গোল-গাল দেখায়। এরা যেন মোমের পুতুল। একটুতে গলে যায়। এসব লোকের শরীর রোগের আখেড়া। আজ এটা, কাল সেটা এমনি প্রতিদিনই অসুখ লেগে থাকে। এরা বাঁচেও না বেশিদিন। সারাদিন যেন শরীর কেমন কেমন করে। কোন কিছুতেই মন বসে না। পড়াশোনাও ভালো লাগে না।

মজবুত পেশীর জন্যে প্রচুর খাটুনি চাই। খাটুনির জন্যে ভালো খাবার চাই। মজবুত পেশীর অধিকারী যে কোনো লোক

যে কোনো কাজ করতে পারে! মজবুত পেশীর ছেলেমেয়েরাই একটি সতেজ, সবল সমাজ গড়তে পারে।



কী সুন্দর গড়ন

মোড়লের মোড়ল : কংকাল

চামড়া বলো, পেশী বলো এরা ভর করে আছে কিসের উপর? চামড়া, পেশী ইত্যাদি তো ঘরের শন, বাঁশ। পাকাঘরের

ইট-সুড়কি। এগুলোকে আটকে রাখার জন্যে খুঁটি বা পিলার লাগবে না ? সত্যিই তো! দেহের খুঁটি বলো, পিলার বলো আর কাঠামোই বলো---সেটি হলো কংকাল। কংকালের মতো কাঠামো দেহে না থাকলে চামড়া, রক্ত, মাংস সব একাকার হয়ে একতাল মাংসপিণ্ড হয়ে যেতো না! সবকিছু ঠিক-ঠাক কাজ করতে পারছে খুঁটির জোরেই। খুঁটি শরীরকে শুধু মজবুতই রাখছে না, এর কতো কাজ।



সিন্দুকের মতো নয় কি?

গোটা কংকালকে দুভাগে ভাগ করে নেই। (১) উপাঙ্গীয় ও (২) অক্ষীয় কংকাল। উপাঙ্গীয় কংকালের মধ্যে রয়েছে হাত পায়ের হাড়। আবার হাত ও পায়ের হাড় কাংকালের যেসব হাড়ের সাথে লেগে থাকে সেসবকেও উপাঙ্গীয় হাড় বলা হয়।

অক্ষীয় হাড়ের মধ্যে রয়েছে মাথার খুলি, মেরুদণ্ড, পাঁজর ইত্যাদি। মাথা সমস্ত শরীরের হেড অফিস। হেড অফিসের

জন্যে মজবুত সিন্দুক চাই। সোনা, মণি-মুক্তা রাখার জন্যে কি? না, ব্রেন বা মস্তিষ্ককে রাখার জন্যে। মানুষের মস্তিষ্ক সোনার চেয়ে দামী। এর জন্যে দামী সিন্দুক এই খুলি। দেখো তো সিন্দুকটি কী সুন্দর আর শক্ত করে বানানো। চোখ, কান, নাক,

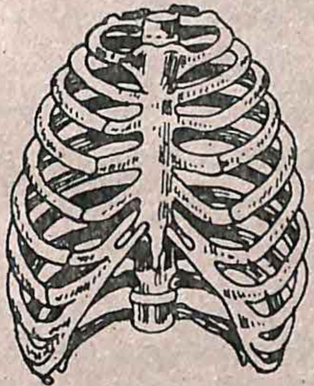


হাড়ের মালা

মুখ সবই খুলির ফোকরে থাকে। খুলিকে খুললে অনেক ধরনের হাড় বেরোয়। ওসবের বিদঘুটে নাম এখন নাই বা জানলে।

মেরুদণ্ড গাছের গুড়ির মতো। মাথার খুলি, পাঁজর, হাত, ইত্যাদি যেন মেরুদণ্ডের শাখা-প্রশাখা। মেরুদণ্ড ঠিক না

থাকলে সব বরবাদ। দেহকে খাড়া রাখতে না পারলে কোন কাজই হবে না। গাছের গুড়ির মতো শক্ত হলে শরীরটাকে কি বাঁকানো যেতো? দেখতে গুড়ির মতো বা দণ্ডের মতো মনে হলেও এটি কিন্তু টুকরো টুকরো হাড় দিয়ে তৈরি। যেন হাড়ের মালা। দুটুকরো হাড়ের মাঝে নরম, পাতলা একটা হাড় ও এক প্রকার রস থাকে। এর জন্যে শরীরকে আমরা যেদিক ইচ্ছা বাঁকাতে পারি।



বাক্স নয় কি?

মেরুদণ্ডের দুপাশে বারো জোড়া ধনুকের মতো বাঁকানো লম্বা হাড় এসে একটি হাড়ের বাক্স তৈরি হয়েছে। এই হাড়-গুলির নাম পাঁজর। পাঁজরের বাক্সটিও মহামূল্যবান। এই বাক্সেই থাকে হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস ইত্যাদি। দেহের এই অংশের নাম বুক।

বুকের নিচেই পেট। এ অঞ্চলকে উদরও বলা যায়। এখানে হাড়ের বেড় তেমন একটা নেই। পাকস্থলি, অন্ত্র ইত্যাদির নড়াচড়া তো চাই। হাড়ের বাঁধনে তা তো সম্ভব

নয়। এ অংশে যকৃৎ, বৃক্ক, অগ্ন্যাশয়, প্লীহা ইত্যাদি সব থাকে। হাড়কে সবাই শক্ত বলেই জানে। শক্ত তো বটেই। তবে হাড়ের অর্ধেকই কিন্তু পানি। কি, বিশ্বাস হয় না? হাড় গুড়ো করলে টের পাবে। আর বাকি অর্ধেক চুন ও আঠা জাতীয় জিনিস। হাড় শক্ত হয় এসবের জন্যেই।

হাড় ফাঁপা কেন? ভরাট হলে শরীরের ওজন বেড়ে যেতো না? অতো ওজন নিয়ে কি চলাফেরা করা যায়। বেশ অসুবিধে হতো। আরো একটি বড় কারণ আছে। হাড়ের ফোকরে একটি গোপন কারখানা আছে। এই কারখানায় রক্তের লোহিত কণিকা তৈরি হয়। রক্ত তো আমাদের শরীরে খুবই দরকারী জিনিস। রক্তই তো সব খাবার দেহের বিভিন্ন যায়গায় চালান দেয়। লোহিত কণিকা রক্তের একটি মূল্যবান উপাদান। এই কারখানার মালিক কে? মজ্জা, হ্যাঁ, মজ্জাই ওসব লোহিত কণিকা তৈরি করে।

শরীর নাড়া-চাড়া না করলে, খেলাধূলা না করলে হাড় শক্ত হয় না। কাজেই প্রচুর পরিশ্রম করতে হয়। একটু অধটু ব্যায়াম করলে মন্দ হয় না। এতে হাড় মজবুত হয় এবং বাড়ে।

আপাতত এখানেই থাক। আজব কলের কথা কথা বলে শেষ নেই। চামড়া, পেশী ও কংকালের কতো কথা যে বাকি রয়ে গেল। আজব কলের আজব কথা বড়ো হয়ে আরো কতো জানতে পারবে।

জীবন মানে জল

বাজার থেকে ফেরার পর মিঠুকে জিজ্ঞেস করলাম—

মিঠু কি কি এনেছো !

মিঠু বলল—

দু সের মাংস, তিন সের আলু।

আমি বললাম, না, মোটেই না।

তুমি এনেছো তিন পোয়া মাংস আর তিন পোয়া আলু ! বাকি সব পানি। বাজার থেকে পয়সা দিয়ে পানি কিনে আনলে !

মিঠু অবাক চোখে চেয়ে রইলো।

কাকু বলে কি !

আমি আবার জোর দিয়ে বললাম—

কী, ঠিক বলিনি ?

মিঠু লা-জবাব।

ঠিক আছে, প্রমাণ চাও ? মিঠুকে বললাম।

নিয়ে এস দুটো ছোট প্লেট, একটি কড়াই, একটি বটি, একটি গ্লাস।

এক এক করে সব এলো, মিঠু, বিটু, সুরমা, কুশি, সম্রাট, স্বাগত।

বড় বড় চোখ করে দেখতে লাগলো কি হচ্ছে।

মাংস কুচি কুচি করে কেটে একটি ছোট প্লেটে রেখে আর একটি প্লেট দিয়ে ঢেকে দিলাম। মাংস সহ প্লেটটিকে কড়াইয়ে কাত করে রাখলাম। সবাইকে বললাম ঘন্টাখানেক পরে এসো।

এক ঘন্টা পর কড়াইতে বেশ পরিমাণ রক্ত-জল জমা হয়েছে দেখা গেলো।

ওরা বললো, এ তো রক্ত, জল নয়।

আমি রক্তটাকে গ্লাসে ঢেলে নিয়ে বললাম--আধ ঘন্টা পর এসো।

আধ ঘন্টা পর দেখা গেলো গ্লাসের তলায় সামান্য লাল রঙের মতো কি যেন জমে আছে। আর ওসবের উপর গ্লাসের প্রায় সবটুকুই যেন পানি।

একটা কমলা বা তরমুজ এনে পরীক্ষাটি করো, তাহলে আমার কথা কতটা সত্যি বুঝতে পারবে।

তোমার ওজন কতো?

ত্রিশ সের।

আসলে তোমার শরীরে প্রায় বিশ সেরই পানি। দশ সের মাংস আর হাড়।

পানি, পানি আর পানি।

পৃথিবীর প্রায় সবটুকুই পানিতে ভর্তি বলা যায়। এমনিতে তো তিনভাগ হ্রদ, পুকুর, নদী, সমুদ্রের পানিতে ঢাকা। ডাঙ্গার ধুলোবালি, গাছপালা, জীবজন্তু সব কিছুই যেন এক একটি পানির কলস, ঘটি-বাটি।

পানি ছাড়া কারো উপায় নেই। সবাইকে বার বার পানির কাছে ফিরে আসতেই হয়। নইলে বাঁচার জো নেই।

শহরে লাখ লাখ মানুষ। এতে ছড়িয়ে আছে দালান, কুঁড়েঘর, কলকারখানা, গুদামঘর, স্কুলঘর, কলেজঘর। দিন-রাত সবাই ছুটছে তো ছুটছে। গাড়ি ছুটছে, স্কুটার ছুটছে, ছুটছে অগুনতি মানুষ। এখানে জীবনের প্রবাহ দেখার মতো।

সবার আগোচরে মাটির তলা দিয়ে আরেকটি জীবন প্রবাহিত হচ্ছে। অনেক দূর থেকে আসে সে প্রবাহ। আঁকা-বাঁকা পাইপ দিয়ে সবার ঘরে ঘরে পৌঁছে যায় এ প্রবাহের ধারা। একদিন বন্ধ থাকলে সর্বত্র হাহাকার, চীৎকার।

পানি ছাড়া শহর অচল। অচল গাছপালা, প্রাণীর জীবন।

পৃথিবীর যে অঞ্চলেই যাও পানি চাই। চাঁদে যাও পানি চাই। গাছপালার জন্যে পানির দরকার আরো বেশি।

প্রাণী ও গাছপালার জন্যে পানি অতো দরকারী কেন?

প্রথম; দরকার দেহের বৃদ্ধির জন্য। সরাসরি না পেলেও খাবারের মধ্যে দিয়ে মানুষ প্রতিদিন অন্তত ২-৩ সের পানি পান করছে। যে পরিমাণ পানি শরীরে যাচ্ছে সে পরিমাণ দেহের ওজন বাড়ার কথা। কিন্তু বাড়ে না তো, কেন?

পানি যে অহরহ দেহ থেকে বেড়িয়ে যাচ্ছে। প্রস্রাব, ঘাম ও নিঃশ্বাসের মধ্যে দিয়ে বেরয়। টের পাও না। শীতের ভোরে মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস ফেললে কুয়াশার মতো বেরয় দেখতে পাও? অথবা একটা আয়না নিয়ে কাচের উপর নিঃশ্বাস ফেলতে থাক। দেখবে কিছুক্ষণ পর কাচ ঝাপসা হয়ে গেলো। আয়নাতে দেখবে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পানির কণা। বিবর্ধক কাচ নিয়ে দেখলে আরো স্পষ্ট দেখতে পাবে।

গাছপালা সারাক্ষণ পানি গ্রহণ করে ও ছাড়ে। সকাল বেলা, নিশুতি রাতে গাছের নিচে গেলেই দেখতে পাবে টুপ টুপ করে ফোঁটা ফোঁটা পানি ঝড়ছে।

প্রাণী ও উদ্ভিদের শরীর থেকে এভাবে প্রতিক্ষণে পানি বেরিয়ে যাচ্ছে। পানি যে কোনো ভাবে গ্রহণ না করলে বাঁচবে কি করে?

সে তো বোঝা গেলো প্রাণী ও উদ্ভিদকে পানি গ্রহণ করতে হয়। কিন্তু পানি দেহে কাজটা করে কি?

তোমরা তো জানো জীবদেহ অসংখ্য কোষ দিয়ে গড়া। কোষ এতো ছোট যে খালি চোখে দেখা যায় না। মাইক্রোস্কোপ দিয়ে দেখতে হয়। কোষের ভিতরে এক ধরনের তরল পদার্থ থাকে। এই তরল পদার্থই দেহের সব কাজকর্ম চালায়। সুতরাং কোষের জন্য খাদ্য-খাবার দরকার। তা-ও বিভিন্ন ধরনের খাবার। খাবার ভেঙে কোষ শক্তিলাভ করে। কোষে এ খাবার যায় কি করে! নিয়ে যায় কে?

উদ্ভিদকোষে খাবার পেঁছে দেয় পানি। প্রাণিকোষে পেঁছে দেয় রক্ত। কেন? খনিজ পদার্থ বা অন্য শুকনো পদার্থ কোষে ঢোকার পথ পায় না পানি ছাড়া। একটু উদাহরণ দিয়ে বলি।

একটা চোষ কাগজ নাও। ওটাকে ফানেলের মতো বা চোঙ্গার মতো ভাঁজ করে একটি গ্লাসে বসাও। ফানেলের ভিতর অল্প চিনি ফেলো। চোষ কাগজের বাইরে আঙ্গুল বুলিয়ে আঙ্গুলকে মুখে লাগাও। একটুও মিষ্টি লাগবে না। ফানেলে পানি দাও এবার দেখ, মিষ্টি লাগবে। চিনিটাকে চোষ কাগজের ওপারে বয়ে নিয়ে গেলো পানি।

কোষের দেওয়ালও অনেকটা এরকম ঝিল্লী দিয়ে গড়া। সুতরাং প্রয়োজনীয় সব জিনিস কোষকে পেতে হলে পানির সাহায্য দরকার। মজার কথা, পানিতে প্রায় সব জিনিসই দ্রবীভূত হয়। রক্তের অধিকাংশই কিন্তু পানি।

জীবদেহের যাবতীয় আবর্জনা প্রস্রাব, ঘাম, নিঃশ্বাস ও মল দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। বিশেষ করে প্রস্রাব, ঘাম ও নিঃশ্বাস। এসব বহন করছে পানি। এতে দেহে পানির ঘাটতি হয়। কোষ শুকিয়ে আসে। এ ঘাটতি পূরণের জন্য পানি চাই। সে পানি দেহ পায় খাবারের সাথে অথবা সরাসরি। এ জন্য প্রচুর পানি

পান করা দরকার। পানি দেওয়া-নেওয়ার এ কাজ কবে শুরু হয়েছিল কে জানে। এর শেষ আছে কিনা তা-ও জানিনে।

জানতে গিয়ে এটুকুই শুধু জানি।

পানিই জীবন, জীবনই পানি।

কাগজের কথা

আমি যার বুকে কলম চালাচ্ছি, তোমরা যার উপর চোখ বুলিয়ে যাচ্ছো তার নাম সবাই জানো। ইংরেজীতে 'পেপার' (Paper), বাংলায় কাগজ। পেপার শব্দটির উৎপত্তি 'প্যাপিরাস' থেকে। প্যাপিরাস এক প্রকার নরম গাছ। গাছটির প্রথম আবিষ্কার মিশরের নীল নদের অববাহিকায়। 'প্যাপিরাস' আসলে গ্রীক শব্দ। ল্যাটিন শব্দ মারফৎ পরিবর্তিত হয়ে পরে ইংরেজী 'পেপার'-এ দাঁড়ায়। বাংলায় কাগজ শব্দটি ফারসী ভাষা থেকে এসেছে।

হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের পূর্বপুরুষেরা তাদের চিন্তা-ভাবনাকে ধরে রাখার জন্যে একটি মাধ্যম আবিষ্কারের চেষ্টায় নিরলস সাধনা করে গিয়েছিলেন। মাধ্যম আবিষ্কারে ব্যর্থ হয়ে প্রাচীন ভারতীয়েরা শোনার সাহায্যে যুগযুগের চিন্তা-প্রবাহকে উত্তরপুরুষদের মধ্যে রেখে যাবার প্রয়াস পেতেন। যাঁদের স্মরণশক্তি প্রখর ছিলো তাঁদেরকে এই দুরূহ কাজে নিয়োগ করা হতো। বেদ-উপনিষদে তাঁরাই 'শ্রুতিধর'। এ কারণে বেদের অপর নাম "শ্রুতি"।

এই উপায়ে চিন্তাধারা ভারী বংশধরদের কাছে যথাযথ-ভাবে পেঁাছানো যে সম্ভব নয় তা তোমরা সহজেই বুঝতে পারো। পেঁাছালও তা অর্ধসত্য বা বিকৃত হবার সম্ভাবনা থেকে যায়। তাই লেখার মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকলো ছাগল, ভেড়া, হরিণ, সাপ ও অন্যান্য জীবজন্তুর চামড়া। বিভিন্ন গাছের পাতাও এ উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতো। অতো বড় বড় চিন্তা সংক্ষিপ্তভাবে সাঙ্কেতিক শব্দে মুদ্রিত হতো পশুর ছাল বা গাছের

পাতায়। কেউ কেউ পাথর খোদাই করে বা গুহার দেয়ালে তাঁদের ধ্যান-ধারণার স্বাক্ষর এঁকে রাখতেন। এভাবে ভাষা ও চিত্রশিল্পের সূত্রপাত হয়।

এতেও মানুষ সন্তুষ্ট হতে পারলো না। সন্ধানী মানুষ সমস্যার সুষ্ঠু সমাধানের জন্যে ব্যাকুল হয়ে উঠলো। সমাধানের প্রাথমিক সূত্র আবিষ্কৃত হলো প্রাচীন মিশরীয়দের কাছে। সেই সূত্রই হলো 'প্যাপিরাস'। গাছটির পুরো নাম সাইপেরাস প্যাপিরাস (*Cyperus papyrus*)।

প্যাপিরাস একজাতীয় জলজ উদ্ভিদ। উচ্চতায় পনর ফুট। ত্রিকোণাকৃতির মসৃণ শাখাহীন কাণ্ড। কাণ্ডের অগ্রভাগ একগুচ্ছ পালকের মতো সবুজ পাতায় সুশোভিত। এরা সাধারণত স্যাঁতসেঁতে বা জল-কাদাময় স্থানে জন্মায়। জানা যায়, মিশরীয়রা এদের প্রথম আবিষ্কার করে মেম্পিসে; নীল নদের অববাহিকায়।

এই উদ্ভিদ থেকে অতি সহজ পদ্ধতিতে কাগজ তৈরি করা হতো। কাণ্ডটিকে প্রথমে রোদে শুকানো হয়, পরে ফালি ফালি করে কেটে আড়াআড়িভাবে বুনে নেওয়া হয়। বুননো ফালি-গুলো জালের উপর ফেলে রেখে শুকিয়ে কাদা-জলে চুবানো হয়। এরপর এসবকে রোদে শুকানোর পর লেখার কাজে ব্যবহার করা হতো। চার হাজার বছর আগে তৈরি সেই কাজকে সমাধিস্তম্ভের নিচে আজো অক্ষত অবস্থায় পাওয়া যায়। এখনো প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন হিসেবে, মিশরীয়দের সাঙ্কেতিক ভাষা বুকে নিয়ে প্যাপিরাস আমাদের কাছে হাজির হচ্ছে। ভারতে অবাক লাগে নাকি?

মিশর দেশে সে সময়ে প্রচুর কাগজ উৎপাদিত হতো। পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলসমূহে এই কাগজ প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী

হতো। শোনা যায়, পারগামামের রাজার পাণ্ডুলিপির একটি সুবৃহৎ গ্রন্থাগার ছিল। পারগামাম এশিয়া মাইনরের সুপ্রসিদ্ধ প্রাচীন শহর। গ্রন্থাগারের খবর মিশরের টলেমী বংশোদ্ভূত এক ফারাও রাজার গোচরীভূত হলে তিনি তৎক্ষণাৎ কাগজ রপ্তানীর ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারী করেন। কাগজের অভাবে পারগামামের অধিবাসীরা বিকল্প হিসাবে ছাগল ও ভেড়ার চামড়া ব্যবহার করতে শুরু করেন। তাঁরা চামড়া পাকা করায় এতো পারদর্শী হয়েছিলেন যে চামড়ার উভয় পাশে লিখন-পঠন সম্ভব করে তুলেছিলেন।

লেখার এ ধরনের কাগজের নাম শহরের নামানুসারে ,পারগামাম (Pergamum) রাখা হয়। ল্যাটিনে পারগামেনা (Pergamena), ফ্রান্স ভাষায় পারচেমিন (Perchemin) এবং ইংরেজীতে পার্চমেন্ট (Perchment) হলো পারগামাম শব্দের পরিবর্তিত রূপ। পার্চমেন্ট পেপারের (Parchment paper) নাম হয়তো তোমরা শুনে থাকবে। শক্ত, পুরু কাগজকে পার্চমেন্ট পেপার বলা হয়ে থাকে। নিম্নমানের প্যাপিরাস কাগজকে বলা হতো 'প্যাপিরাস এমপোরেটিকাস' (*Papyrus emporeticus*)। গ্রীক শব্দ এমপোরোস (Emporos)-এর অর্থ মার্চেন্ট (marchant) বা বণিক। নিম্নমানের প্যাপিরাস কাগজ, ভঙ্গুর বা সহজেই নষ্ট হয় এমন দ্রব্যাদির সংরক্ষণে মোড়ানোর কাজে ব্যবহৃত হতো।

রোম সাম্রাজ্য কর্তৃক মিশর অধিকৃত হবার পর রোমানরা কাগজ শিল্পের প্রভূত উন্নতিসাধনে মনোনিবেশ করে। আবার রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর ইটালীয়রা তাঁদের দেশে কাগজের উৎপাদন অব্যাহত রাখে। কিন্তু সপ্তম দশকে আরবরা মিশর অধিকার করলে রোম ও ইটালী কাগজের

কাঁচামাল সরবরাহ থেকে বঞ্চিত হয়। মিশর অধিকার করলেও আরবরা প্যাপিরাস থেকে কাগজ তৈরির কৌশল অবলম্বন করেন নি। তাঁরা কাগজ তৈরির নূতন কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন পারসীয়ানদের কাছ থেকে। পারসীয়ানরা শিক্ষা পেয়েছিলেন চীনাদের থেকে। চীন হাজার হাজার বছর আগে কাগজ তৈরির উন্নত পদ্ধতি আবিষ্কার করে ফেলেছিলো। ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন অংশের জনসাধারণ যখন প্যাপিরাস থেকে কাগজ তৈরির পুরনো পদ্ধতি বর্জন করে নূতন পদ্ধতি উদ্ভাবনের জন্যে হন্যে হয়ে ফিরছিলো তখন নীরবে, নিঃশব্দে, নিঃসঙ্গ চীন উন্নত পদ্ধতিতে উন্নতমানের কাগজ তৈরি করে চলছিলো দেয়ালের অন্তরালে। ছেঁড়া কাপড়, বাতিল রেশম, শন, ধানের পাতা, তুঁত গাছের বাকল থেকে চীন শত শত বছর ধরে কাগজ প্রস্তুত করে আসছিলো। এভাবে তাঁরা ফালতু জিনিসগুলোকে কাগজ শিল্পের উপকরণ হিসাবে ব্যবহার করতো।

চীনাদের কাগজ তৈরির পদ্ধতি ছিল সহজ। শুধু প্রয়োজন হতো অসীম ধৈর্যের। বাতিল ও অন্যান্য দ্রব্যসমূহকে পানিযোগে অনবরত সিদ্ধ করে ঘন মণ্ডে পরিণত করা হতো। তারপর উত্তপ্ত চুনাপাথরের ফলকের উপর মণ্ডের আস্তরণ বিছিয়ে দিয়ে শুকাতে দিতো। যেহেতু কাগজের ভিতরের পৃষ্ঠা অমসৃণ ও অসমান হতো সেহেতু দুটো কাগজের অমসৃণ দিক দিক আঠা দিয়ে জোড়া লাগানো হতো। এতে কাগজটি মজবুত হতো ও উভয় পাশে লেখার উপযোগী হয়ে উঠতো। আরবরাও একই পদ্ধতি অনুসরণ করতো।

১২০০ সালের মরক্কোর ফেজ নগরীতে কাগজ তৈরির বিরাট কারখানা স্থাপিত হয়। কিন্তু আরবরা শুধু শাদা বা প্রায়-শাদা

ছেঁড়া কাপড়-চোপড় কাগজ তৈরিতে ব্যবহার করতো। কারণ তাঁরা রঙীন কাপড়কে শাদা কাপড়ে রূপান্তরিত করার (Bleaching action) রাসায়নিক প্রক্রিয়া জানতো না।

পূর্বে উল্লেখিত পদ্ধতিসমূহ সহজ বটে কিন্তু পরিশ্রমের। উৎপাদন খরচ পড়তো বেশী আর প্রস্তুত হতো প্রয়োজনের তুলনায় নগন্য সংখ্যক। সাধারণের জন্য কাগজ তখনকার দিনে সুলভ ছিলো না। শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তারে কাগজের অবদান অপরিসীম। সভ্যতার বিকাশ কাগজ শিল্পের উন্নতির উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিলো। শিক্ষা ও সংস্কৃতি তৎকালে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার কারণসমূহের মধ্যে কাগজের দুষ্প্রাপ্যতাও একটি।

কালে কালে কাগজের চাহিদা বেড়ে যাওয়াতে উৎপাদকেরা কাগজ তৈরির বিবিধ মাল-মশলা ও উন্নততর পদ্ধতি আবিষ্কারে তৎপর হয়ে ওঠে। তখনো পর্যন্ত কাগজশিল্পের নির্ভরযোগ্য উপাদান ছিল পুরনো কাপড়। ১৭৯৯-সালে ফ্রান্সের একজন শ্রমিক একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন। সেই যন্ত্রের রোলিং মেশিনে বেশ বড় ও দীর্ঘ কাগজ সস্তায় ও দ্রুত উৎপাদন করা সম্ভব হয়। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল কাগজের উপাদানের ব্যাপারে। যন্ত্র আবিষ্কর্তার নাম লুই রবার্ট।

উপাদান-সমস্যার সমাধানে এগিয়ে এলেন জার্মানীর ফ্রেডরিক কেলার। তিনি দীর্ঘদিন ধরে এই বিষয়ে গবেষণারত ছিলেন। তিনি বললেন বাজে গাছ থেকেও মণ্ড তৈরি করা সম্ভব। কাগজ শিল্পে এই বিখ্যাত আবিষ্কারটি হয় ১৮৪৫ সালে। লুই রবার্টের যন্ত্র এখন পুরোপুরি কাজে লাগানো সম্ভব হল। কাগজশিল্প শৈশব থেকে কৈশোরে পদার্পণ করল।

এর পর থেকে নিউজপ্রিন্ট, বিভিন্ন মান ও গুণের লেখার কাগজ, পুরু বাদামী কাগজ, টিস্যু পেপার ও রঙবেরঙের কাগজ

তৈরি শুরু হয়ে গেলো। বিভিন্ন দেশ কাগজ উৎপাদনে স্বয়ং-সম্পূর্ণ হবার চেষ্টা চালাতে লাগলো।

কাগজ-শিল্পে বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই। এশিয়ার বৃহত্তম কাগজের কল, 'কর্ণফুলী পেপার মিল' এদেশেরই পার্বত্য চট্টগ্রামে অবস্থিত। খুলনার নিউজপ্রিন্ট তৈরির কারখানার খবর তোমরা নিশ্চয় জানো। আমাদের কলগুলি দেশের চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানী করে প্রচুর বিদেশী মুদ্রা অর্জনে সক্ষম। কলগুলিতে দেশের বাঁশ, শন, খড়, বাতিল রেশম, গাছ-গাছড়া ব্যবহৃত হচ্ছে। ইদানীং বাতিল পাটকেও কাজে লাগানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। সবুজ বনের বুকে কুল কুল শব্দে বয়ে যাওয়া কর্ণফুলীর তীরে, কর্ণফুলী কাগজের কলে গিয়ে কাগজ তৈরীর বিরাট কাণ্ডকারখানা দেখে তোমাদের সবার মনে হবে প্যাপিরাসের যুগ থেকে আমরা কতনা এগিয়ে রয়েছি।

ওঃ কী মশা

রেতে মশা দিনে মাছি
এ নিয়ে কলকাতায় আছি।

রাতে উৎপাত

এ ছড়াটি কে লিখেছিলেন বলতে পারো ?

সেকালের এক মস্ত কবি। কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ।

কেন লিখেছিলেন তা কি বুঝিয়ে বলতে হবে ?

তোমাদের মধ্যে এমন কে আছো যে একটিবারও মশার কামড় খাও নি। গ্রাম, শহর. হ্যারিকেন-চেরাগের পিটপিটে আলো বা ইলেকট্রিক বাতির ঝলসানো আলো সব জায়গাতেই মশার উৎপাত। লোহার জাল, নাইলনের মশারী, ডি. ডি. টি, স্প্রে, ধোঁয়া, ধূপ কোনোটা দিয়ে এদেরে ঠেকানো যায় না। এরা আমাদের চির সাথী। চির শত্রুও বটে।

হুল ফুটায়, রক্ত শুষে

মশা শুধু হুল ফুটায় না, রক্তও শুষে।

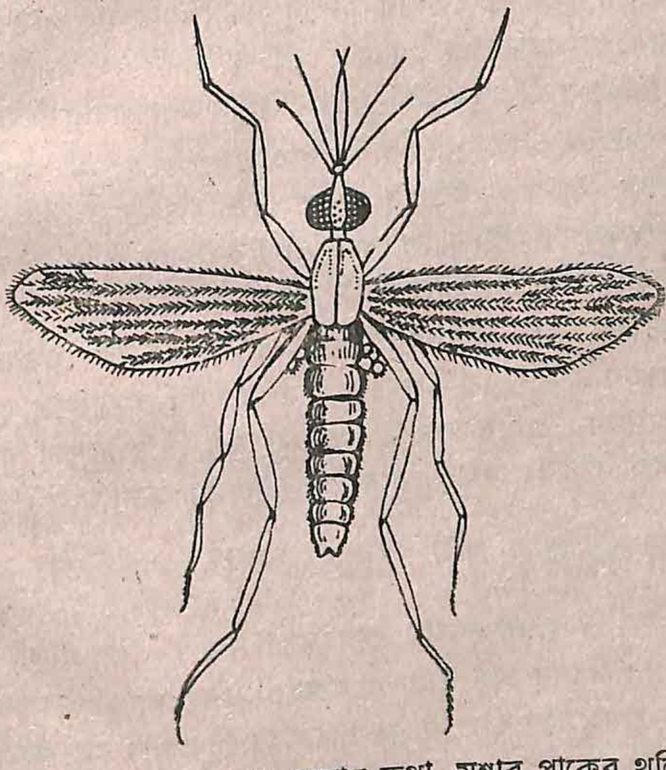
মানুষ, গরু, মোষ, ছাগল, কুকুর, পাখি কেউ মশার কামড় থেকে রেহাই পায় না।

মশার হুল ফুটানোকে আমরা মশার কামড় বলি।

হুল ফুটিয়ে, রক্ত শুষে মশার সাধ মিটে না। মশা আমাদের শরীরে ম্যালেরিয়া জ্বরের জীবাণুও ছড়ায়। মশা ইচ্ছে করে জীবাণু ছড়ায় বললে ভুল হবে। ও বেচারীর এতে বিন্দুমাত্র দোষ নেই। মশার অজান্তেই রোগ-বীজ ছড়িয়ে পড়ে কেমন করে ?

রোগ ছড়ায়

ধর, কোন একজন ম্যালেরিয়া রোগীর শরীরে মশা হুল ফুটালো এবং রোগীর রক্ত শুষে নিলো। ম্যালেরিয়ার জীবাণু রোগীর রক্তে কিলবিল করতে থাকে। রক্ত শুষে নেবার সময় জীবাণু মশার পেটে চালান হয়ে গেলো। মশার পাকস্থলি থেকে জীবাণু মশার লালাগ্রন্থিতে গিয়ে হাজির। পাকের থলি---পাকস্থলি।



পাক মানে হজম হওয়া। মজার কথা, মশার পাকের থলিতে রক্ত হজম হয় বটে জীবাণু হজম হয় না। জীবাণু পাকস্থলি ভেদ করে বেরিয়ে আসে। লালা যে গ্রন্থিতে তৈরি হয় এর নাম লালাগ্রন্থি। লালার আরেক নাম থুথু। থুথু বা লালার

এই গ্রন্থি মুখের কাছাকাছিই থাকে। ম্যালেরিয়া রোগীর রক্ত খাওয়া এ মশাটি যখন নীরোগ মানুষের দেহে হুল ফুটাবে তখন ওর লালাগ্রন্থি থেকে রোগ জীবাণু মানুষটির রক্তে চলে যাবে।

পরিচয়

সব মশা ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু বয়ে বেড়ায় না। পৃথিবীতে হরেক রকমের মশা আছে। স্ত্রী অ্যানোফিলিস মশাই শুধু ম্যালেরিয়ার জীবাণু ছড়ায়। অ্যানোফিলিস মশা আবার কি নাম?

তাইতো, তোমাদেরকে মশার পরিচয় দেওয়া হয় নি। অ্যানো-ফিলিস, কিউলেক্স ইত্যাদি মশার বৈজ্ঞানিক নাম। পৃথিবীর সব মানুষ চট করে যাতে কোন প্রাণীকে চিনতে পারে সে জন্য বিজ্ঞানীরা প্রতিটি প্রাণীর একটি নাম ঠিক করে দেন। এ ছাড়া বিজ্ঞানীরা সব প্রাণীকে সহজে শনাক্ত করার প্রয়োজনে এদেরকে বিভিন্ন পর্ব, শ্রেণী, বর্গ, গোত্র, গণ ইত্যাদিতে ভাগ করেছেন। এ সব বিষয়ে তোমরা বড় হয়ে ভালো করে জানতে পারবে। মশার আরো একটু পরিচয় জানা যাক।

শ্রেণী বিভাগ

সব প্রাণীকে সরল দুভাগে ভাগ করা যায়। শির দাঁড়া বা মেরুদণ্ড যাদের নেই তারা অমেরুদণ্ডী এবং যাদের মেরুদণ্ড আছে তারা মেরুদণ্ডী প্রাণী। মশা অমেরুদণ্ডী প্রাণী। অমেরুদণ্ডী প্রাণিকুলকে অনেকগুলি পর্বে বিভক্ত করা হয়েছে। মশা যে পর্বের অধীন সে পর্বের নাম। আর্থ্রোপোডা। আর্থ্রো মানে সন্ধি আর পোডা অর্থ পা। বাংলায় এই পর্বের নাম সন্ধিপদী। সন্ধিপদ মানে হলো যে সব পাকে গুটিয়ে রাখার মতো ব্যবস্থা

থাকে তেমনি পা। মানুষের পায়ে হাঁটু ও হাতে কনুই থাকার জন্য মানুষ পা, হাত ভাঁজ করে বা গুটিয়ে রাখতে পারে। অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে মাত্র সন্ধিপদী পর্বের প্রাণীর এই গুণ রয়েছে। সন্ধিপদী পর্ব কতকগুলি শ্রেণীতে বিভক্ত। মশার শ্রেণীর নাম ইনসেকটা। ইনসেকট মানে পতঙ্গ। মশাও এক ধরনের পতঙ্গ। পতঙ্গ শ্রেণী কয়টি বর্গে বিভক্ত। মশা ডিপ্টেরা বর্গের অধীনে। বর্গ ডিপ্টেরা যে কয়টি গোত্রে বিভক্ত সেসবের মধ্যে মশার গোত্রের নাম কিউলিসিডি। গোত্র কিউলিসিডি কতিপয় গণে বিভক্ত। গণের মধ্যে দুটি গুরুত্বপূর্ণ গণ হলো; কিউলেক্স ও অ্যানোফিলিস। কিউলেক্স, অ্যানোফিলিস গণের অধীনে রয়েছে অনেক প্রজাতি। প্রজাতির নাম উঁচু ক্লাশে জানতে পারবে। প্রাণীর বৈজ্ঞানিক নামের বিষয়ে উপরে উল্লেখ করেছিলাম। এ বিষয়ে কিছু বুঝতে পেরেছো আশা করা যায়।

আরো কিছু প্রশ্ন

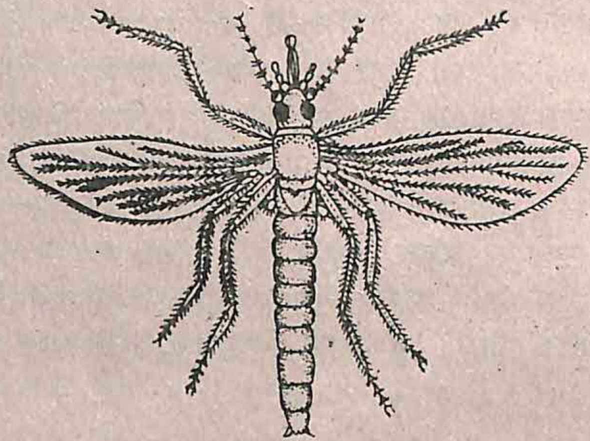
মশারা কোথায় থাকে? পৃথিবীর কোন্ কোন্ অঞ্চলে এদেরে পাওয়া যায়? ওরা খায় কি? বাঁচে কতদিন? ওদের বাচ্চা হয় কি? ওদের দেখতে কেমন? আর এদের জীবন-চক্র আবর্তিত হয় কেমন করে?

কোথায় থাকে

বয়স্ক মশা গাছের ফোকর, পাথরের ফাটল, পাহাড়ের গুহা, ঘরের অন্ধকার কোনা, গাছ বাঁশের ঘন ছায়া ইত্যাদিতে লুকিয়ে থাকে। দিনের আলো এদের পছন্দ নয়। ঝলসানো আলো এদের অপছন্দ। অল্প আলো, অন্ধকার ও ভোর বেলায় বেরুতে এরা ভালোবাসে।

কোন্ অঞ্চলে পাওয়া যায়

বলতে গেলে পৃথিবীর সব জায়গাতেই মশা দেখা যায়। পৃথিবীর উষ্ণ মণ্ডল, নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল ও অর্ধনাতিশীতোষ্ণ মণ্ডলে এদেরকে পাওয়া যায়। খুব গরম যে অঞ্চলে এর নাম



উষ্ণ মণ্ডল। গরম নয়, শীতও নয়--নাতিশীতোষ্ণ মণ্ডল। খুব শীত যেখানে এবং যেখানে সারা বছর বরফ পড়ে সেখানে মশা দেখা যায় না। অর্থাৎ মশা ঠাণ্ডা সহ্য করতে পারে না। ঠাণ্ডায় এদের বংশবৃদ্ধিও হয় না। তোমারাও লক্ষ্য করে থাকবে আমাদের দেশে শীতকালে ও ঘোর বর্ষায় মশা কম দেখা যায়। বসন্তকাল ও গ্রীষ্মকালেই এরা আমাদেরকে জ্বালায় বেশি। শহর, গ্রাম, পাকা ঘর, শনের ঘর সব জায়গাতেই এদের পাওয়া যায়।

কি খায়

পুরুষ মশা সাধারণত ফুলের মধু ও ফলের রস খায়। স্ত্রী মশা কিছুদিন পর পর মেরুদণ্ডী প্রাণীর রক্ত খায়। মেরুদণ্ডী

প্রাণীর মধ্যে স্তন্যপায়ী প্রাণীর রক্তই বেশি খায়। স্তনের দুধ যে সব প্রাণী পান করে তাদের নাম স্তন্যপায়ী প্রাণী। রাতের গভীর আঁধারেও কোনো কোনো মশা খায়-দায়। নয়তো স্বল্প আলোতেই খাওয়া দাওয়া এদের পছন্দ।

কতদিন বাঁচে

পুরুষ মশার আয়ু তিন সপ্তাহ। স্ত্রী মশার সাথে মিলিত হবার পর পুরুষ মশা মরে যায়। স্ত্রী মশা তিন সপ্তাহ থেকে কয়েক মাস বাঁচে। ডিম পাড়ার আগে স্ত্রী মশা মরে না।

ডিম দেয়, বাচ্চা ফুটে

বছরে ওরা কয়েকবার ডিম পাড়ে। ডিম পাড়ার জায়গা হলো পুকুর, নর্দমা, ড্রেন, ধানখেত, বদ্ধ ডোবা, খানা-খন্দ ইত্যাদি। প্রবল স্রোতেও ওরা ডিম পাড়ে। ডিম ফুটে বাচ্চা বের হয়। ডিম ফোটার পরপরই যে বাচ্চাটি বের হয় এর নাম শূককীট। শূককীট থেকে মূককীট। মূককীট পূর্ণবয়স্ক মশায় পরিণত হয়।

দেখতে কেমন

মশা উড়ে। মশা গান গায়। মশা উড়ে, গান গায় পাখনা দিয়ে। সে কি কথা? পাখনা দিয়ে গান গায়! সত্যি তাই। মশার পাখনা মিনিটে কয়েক হাজার বার নড়ে। ফলে বাতাসের সাথে ধাক্কা খেয়ে এ শব্দের সৃষ্টি হয়। পাখার এ শব্দটিকে আমাদের কাছে গান মনে হয়। মশার পিঠে দুটি পাখনা থাকে। পাখনা দুটি খুবই পাতলা। মশা বেশ উড়তে পারে। **অ্যানো-ফিলিস** মশা উড়তে পারে বেশি। মশার দেহটাকে মোটামুটি

তিন ভাগে ভাগ করা যায়---মাথা, ধড় ও উদর। মশার শরীর দেখার জন্যে আতশ কাচ ব্যবহার করতে পারো।

মাথা

একটু ভালো করে তাকালে মশার মাথা চিনতে কষ্ট হবে না। মাথার দু'পাশে থাকে দুটো কালো চাকতি। চাকতি তো নয় পুঞ্জাক্ষি। পুঞ্জ মানে এক দল, অক্ষি তো চোখ। একদল চোখ মিলে একটি পুঞ্জাক্ষি। চাকতি দুটোর উপরিভাগে কোনায় দুটো শুঙ্গ থাকে। শুঙ্গ দেখতে পাখির পালকের মতো। পুরুষ মশার শুঙ্গ আবার ঝোপের মতো। শুঙ্গ দেখে পুরুষ মশা, স্ত্রী মশা চেনা যায়। স্ত্রী মশার মুখে আরো একটি বিশেষ অঙ্গ থাকে। শুষ-নল। যে নল দিয়ে এরা রস ও রক্তপান করে। মুখের কয়টি অংশ মিলে শুষ নলটো তৈরি হয়।

ধড়

ধড়ের অংশেই পাখনা ও পা থাকে। ধড় তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রতি খণ্ডের নীচে দুপাশে দুটি পা থাকে। মোট ছয়টি পা। পায়ে সন্ধি থাকে। ধড়ের মাঝের খণ্ডের উপরে দুপাশে রয়েছে পাখনা দুটো।

উদর

মশার উদর দশ খণ্ডে বিভক্ত। উদরের ভিতরে শ্বাস-নল দিয়ে মশা শ্বাস-কাজ চালায়।

জীবন চক্র

আনোফিলিশ মশার কথাই ধরা যাক।

ডিম

এরা একসাথে ৪০-১০০টি ডিম পাড়ে। ডিম দেখতে দুপাশে সুচালো, মাঝে ফোলা বেলুনের মতো। ফলে ডিম পানিতে ভেসে থাকতে পারে। ২৪-৪৮ ঘন্টায় মধ্যে ডিম ফুটে শূককীট বের হয়।

শূককীট

শূককীট দেখতে বিশ্রী। সারা গায়ে লোমের মতো এক ধরনের জিনিস। নাম কুর্চ। দেহ লম্বাটে। কুর্চ দিয়ে শূককীট পানিতে ভাসে। এরা পানির উপরিতলের সাথে সমান্তরালভাবে ভাসে। খায়ও পানির উপরিতল থেকে। শূককীট অবস্থায় থাকে দুই থেকে চার সপ্তাহ। এরপর মূককীটে পরিণত হয়।

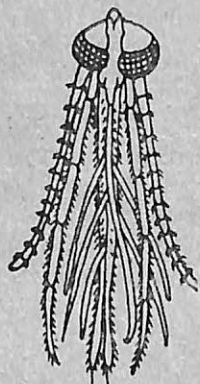
মূককীট

মূককীট গুটির মধ্যে থাকে। মূককীট অবস্থায় সব অঙ্গ তৈরি হয়। মূককীট অবস্থায় ২-৭ দিন। পরে ইমাগোতে পরিণত হয়। ইমাগো থেকে পূর্ণ বয়স্ক মশার রূপ পায়।

কেন এত কথা

মশার বিষয় বলতে বলতে ক্লাশের পড়ার মতো হয়ে গেল। আমি তা চাইনি। উপায় তো নেই। মশা চির শত্রু। সরাসরি আমাদের উপকারে কোনোদিন আসে নি। মশার শরীর বিষয়ে না জানলে কোন্ ধরনের বিষ এর শরীরে কাজ করবে জানা যাবে না। আর কোন্ বয়সে বিষ ছিটাতে হবে তা জানবেই বা কি করে। মশা নিধনের জন্যে কতো আয়োজন। পুকুর, ডোবা, খাল-বিলে মশার ওষুধ কত ছিটানো হলো। মাছ, কেঁচো, শামুক পানির গাছ মারাই সার। মশা আর কমে না।

মশা যেখানে জন্মায়, মশা যেখানে থাকে, সেসব জায়গা পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন না রাখলে এবং সেখানে বিষ না ঢাললে মশা মারা পড়বে কি করে। শহরে মশার ওষুধ ছিটানো হয় কখনো-কখনো। গ্রামে কে ছিটায়! গ্রামের মশা কি শহরে আসতে পারে না!



শুড়

মশা আসলে বড় সমস্যা। তোমাদের জন্য আরো বেশি। মশার জন্যে পড়তে বসাই মুশকিল। এই দেখো না। আমি লিখছি। পা-টাকে কিছুতেই টেবিলের নীচে রাখতে পারছি না। মাঝে মাঝে হাতটাও অটোমেটিক একবার কান একবার মুখ একবার পায়ের দিকে ডাইভ দিচ্ছে। এ জন্যেই বোধ করি কবি ঈশ্বর গুপ্ত ঐ ছড়াটি লিখেছিলেন। তোমরাও মশার গান নিয়ে, হুল ফুটানো নিয়ে লিখো না কেন। মশার হুলটাকে ভোঁতা করে দেবার উপায় বার করতে পারো না?

বহরে ছোট কাজে বড়

খুব ছোট জিনিস।

কারো নজরে পড়ে না। মনেও রাখে না কেউ।

তাতে কি ? বিপদে তো কাজে আসে।

কেমন বিপদ ?

ধরো, পড়ি মরি করে স্কুলে যাচ্ছ। ওমা ! দাওয়ায় পা দিয়েই দেখতে পেলে শার্টের বোতাম ছেঁড়া। হেড স্যার তো বকবেন। উপায় ?

অথবা মনে করো ডানপিটে মন্টু বল নিয়ে ছুট্‌তে গিয়ে 'মাগো' বলে বসে পড়লো। সবাই 'কি হলো, কি হলো' বলে তাকে ঘিরে ধরতেই সে বললো—'কাঁটা'। পায়ে কাঁটা বিঁধেছে। এখন উপায় ?

হ্যাঁ, উপায় আছে। খবর পেয়ে মা-বড়দিরা ছুটে এলেন।

তাঁদের হাতে কি ?

সুচ।

তোমাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে সুচ দেখোনি। বলতো, সুচের কথা কারো কি মনে থাকে! ছোট বলেই কি ?

ছোট হলেই বা কি এসে যায়। সুচ ছাড়া তো অনেক কাজই হতো না। শার্ট, প্যান্ট, পায়জামা, পাঞ্জাবী, ফ্রক্, সেলোয়ার সেলাই করতো কি দিয়ে? লেপ, তোষক, মশারী হবে কি করে? খাতা, বই বাঁধবে কিভাবে? স্কুলের ব্যাগ, বাক্সই বা বানাবে কেমন করে? আর জুতো? অমন দরকারি জিনিসকে কি হেলাফেলা করা যায়!

নকসী কাঁথা তো সবাই দেখেছো। মা মাসীরা সুচ সূতো দিয়ে ফুল, গাছ, লতা, পাতা, নদী, পাহাড়, পাখি কত কিছুরই না নকশা তোলেন। আজকাল তো চটের থলেতেও ডিজাইন করা হয়। রিক্সায় প্লাস্টিকের ফুল তোলা দেখোনি ? এতেও সুচের ব্যবহার আছে। এ ছাড়া টেবিল ক্লথ, চেয়ারের গদীর কাপড়, টেলিভিশন রেডিওর ঢাকনা, শাড়ী, পাঞ্জাবী, ফ্রক ইত্যাদিতে সুচের সাহায্যে চমৎকার সব ডিজাইন করা হয়। সুচ ছাড়া কিন্তু এ সবের কোনটাই সম্ভব হতো না।

মজা কি জানো? অতটুকুন সুচটি তৈরি করতে মানুষকে অনেক দিন ধরে ভাবতে হয়েছে। ভালো কথা, মানুষকে সুচের কথা ভাবতে হলোই বা কেন?

প্রয়োজন যে। প্রয়োজনেই তো সব জিনিসের আবিষ্কার।

সুচ আবিষ্কারের কি প্রয়োজন ছিল ?

একেবারে ঠিক ঠিক করে বলা যাবে না। হাজার হাজার বছর আগের কোন মানুষ আজও বেঁচে থাকলে তার কাছে থেকে শোনা যেতো। কোন মানুষ অতোদিন বাঁচে না। সে কালের মানুষেরা ইতিহাসও লিখে রাখেনি। আমরা অনুমান করতে পারি শুধু। প্রমাণও যে কিছু কিছু পাওয়া যায়নি তেমন নয়।

ধরো, প্রস্তর যুগের মানুষেরা গুহায় থাকতো। তারা তখনো ঘর-দোর বাঁধতে শেখেনি, ওরা বন-জঙ্গলে শিকার ধরতো আর ফল মূল খুঁজে বেড়াতো। ঝড়, বৃষ্টি, শীত সব তাদের উদোম শরীরের ওপর দিয়ে বয়ে যেতো। কনকনে ঠাণ্ডায় কুকঁড়ে গিয়ে কেউ হয়তো পশুর শুকনো চামড়া, গাছের বাকল বা পাতা শরীরে মুড়িয়ে দিলো। এতে একটু ভাল বোধ করলো।

তখন থেকে ওরা এসব জিনিস দেহের আচ্ছাদনরূপে ব্যবহার করতে শুরু করে। আবার সমস্যা দেখা দেয়। শিকার ধরার জন্য দৌড় দিলে বা অন্য কোনো কাজ করলে শরীরের আচ্ছাদন তো রাখা যায় না। খুলে পড়ে যায়। গিঁট দিলে খুলে যায়। অতো পুরু জিনিসে গিঁটও দেয়া যায় না। আচ্ছাদনকে কি করে গায়ে রাখা যায়? তখন হয়তো এ-সবকে বাঁধার জন্য কোন গাছের আঁশ বা পশুর রগ ইত্যাদির খোঁজ পড়লো। আঁশ, রগ পাওয়া গেলো হাতের কাছেই। গাঁথবে কি করে? আজকের সূচের মতো না হলেও তখন এরই মতো সূচালো কোনো জিনিস দিয়ে তারা আচ্ছাদন সেলাই করেছিলো।

ফ্রান্সের দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পশ্চিমে ডেনমার্কের কয়েকটি গুহায় তখনকার দিনে মানুষের ব্যবহার করা অন্যান্য জিনিসের মধ্যে সুচও পাওয়া গেছে। এ সমস্ত সুচ হাড় দিয়ে তৈরী হতো। হাতির দাঁত ও রেইনডিয়ার নামক এক প্রকার হরিণের শিং থেকেই ওসব সুচ তৈরি হতো বলে ধারণা করা হয়।

আজ থেকে সাড়ে নয় হাজার বছর আগের হাড়ের তৈরির একটি সূচ ডেনমার্কের গুহায় পাওয়া গেছে। এই সুচ দিয়ে নাকি জাল বানানো সম্ভব ছিলো। এতো গেলো আগের দিনের মানুষের সুচ ব্যবহার ও তৈরির ইতিহাস। সুচ দিয়ে বিভিন্ন নকশায় সুন্দর সুন্দর ডিজাইন তোলা ইত্যাদি শুরু হলো কবে? সেলাই কাজে দক্ষতাই বা কাদের ছিলো?

এসব প্রশ্নেরও সঠিক জবাব দেয়া মুশকিল। বিভিন্ন জনের লেখা থেকে একটা সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। অনেক দেশের রূপকথায় পুরনো যুগের কিছু কিছু কাহিনী পাওয়া যায়। গ্রীকদেশের রূপকথায় এরকম ভারী চমৎকার একটি কাহিনী আছে।

গ্রীকদেশে ছিলো এক রংকর। সে কাপড় রাঙাতো। তার ছিল এক সুন্দরী মেয়ে। মেয়েটির নাম অ্যারাক্‌নি। অ্যারাক্‌নির তেমন বয়স হয় নি। এই বয়সেই সে খুব সুন্দর সুচিবিদ্যা শিখে ফেলে। তার ওস্তাদ ছিলো দেবী অ্যাথেনা। অ্যারাক্‌নির বয়স কম তো। বুদ্ধি-সুদ্ধিই বা আর কতো!

একদিন সে সুচিবিদ্যায় তার ওস্তাদ দেবী অ্যাথেনাকে চ্যালেঞ্জ করে বসে। তার দাবি সে আথেনা থেকে ভাল কাজ জানে। এ নিয়ে হৈহৈ রৈরৈ ব্যাপার। দেবতার সাথে মানুষের লড়াই। দেব-দেবীর মান থাকে না। উভয়ের সুচিকর্ম যাচাইয়ের জন্য একটি বিচারক কমিটি গঠিত হলো।

অ্যারাক্‌নি অতি নিপুণভাবে সুচিকর্মের মধ্যে দিয়ে দেবতাদের ভালবাসাকে ফুটিয়ে তুলল। আর অ্যাথেনা? অ্যাথেনা গ্রীক দেবতাদের চিত্র ফুটিয়ে তুলল। অ্যারাক্‌নির পরিকল্পনা ও রঙের ব্যবহার এতো সুন্দর হয়েছিল যে বিচার-কেরা অ্যারাক্‌নিকেই শ্রেষ্ঠ বলে রায় দেন। হেরে গিয়ে আথেনা ভীষণ রেগে যায়। সে অ্যারাক্‌নির সুচিকর্মকে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে ও অ্যারাক্‌নির মাথায় আঘাত করে।

অ্যারাক্‌নিও আথেনার অপমানকে হজম করতে পারলো না। সে প্রাণ দেবে স্থির করে। এ জন্যে গলায় রশি বেঁধে ঝুলে পড়ে। দেবী অ্যাথেনা রশি বেঁধে ঝুলে পড়ার মুহূর্তেই নাকি অ্যারাক্‌নিকে মাকড়সা বানিয়ে দেয়। আর গলার রশিটিকে মাকড়সার জালে পরিণত করে।

এ রূপকথা শুনে কি মনে হলো? প্রাচীন গ্রীকদেশে, সুচি-শিল্প বিকাশ লাভ করেছিলো বলে অনুমান করা যায় নাকি? এখানে একটি কথা জানিয়ে রাখছি। প্রাণিবিজ্ঞানীরা মাকড়সা

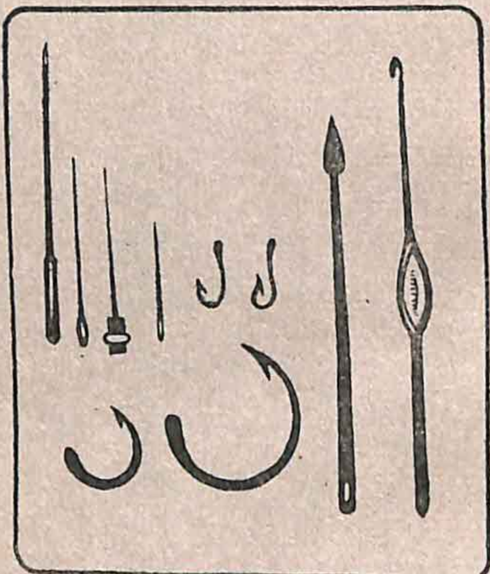
যে শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত, সে শ্রেণীটিকে অ্যারাকনির নাম অনুসারে অ্যারাকনিডা (Arahnida) রাখেন।

কারো কারো মতে, প্রাচীন গ্রীক সভ্যতারও আগে অন্যান্য দেশে সুচিশিল্পের পত্তন হয়। মিশর, ভূমধ্যসাগরীয় উপকূলের প্রাচীন ফীনেসিয়ার জনগণ এ কাজে খুব দক্ষ ছিলো।



খ্রীস্টের জন্মের আগে ইতালি ও প্রাচীন রোমের মেয়েরাও সুচিবিদ্যায় পটু ছিলো বলে জানা যায়। দূর প্রাচ্যের চীন ও জাপান অপূর্ব সুচিকর্ম জানতো। প্রকৃতির বিভিন্ন দৃশ্য, জীব-জন্তু, পাখি, ঘোড়সওয়ার, যুদ্ধের চিত্র ইত্যাদি সুচিকাজের মধ্যে

দিয়ে খুব সুন্দরভাবে ও সব দেশের মেয়েরা তুলে ধরতো বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।' এরপর এই শিল্প ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে।



আমরা তো জেনেছি, একেবারে আগের লোকেরা হাড়ের সুচ ব্যবহার করতো। তারপরে অবস্থার নিশ্চয়ই উন্নতি হয়েছে। মানুষ ধীরে ধীরে ধাতুর ব্যবহার শিখেছে। সে অবশ্যই বিভিন্ন ধাতু দিয়ে সুচ বানানোর চেষ্টা করেছে।

আমাদের মনে হয় শেষাবধি মানুষ লোহাকেই সুচ তৈরির জন্যে বেছে নিয়েছিলো। সুচের দুটি গুণ থাকা দরকার। সুচকে দৃঢ় কিন্তু নমনীয় হতে হবে। অবশ্য বিভিন্ন কাজের জন্যে ভিন্ন ভিন্ন সুচের দরকার। ভিন্ন ভিন্ন সুচের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ধাতুরও দরকার পড়ে। সুচ কিভাবে তৈরি হয় এবার তাই-ই বলা যাক।

পূর্বে ছোট ছোট কারখানায় সুচ তৈরি হতো। ১৩৭০ সালে নুরেমবার্গে এ ধরনের একটি কারখানা ছিলো বলে জানা যায়। ইংল্যাণ্ডের রাণী প্রথম এলিজাবেথের সময় ম্যাকিঞ্জি নামের এক ভদ্রলোকের কারখানায় নাকি সুন্দর সুচ তৈরি হতো। ইংল্যাণ্ডেই রাজা অষ্টম হেনরীর সময় বহু সুচের কারখানা গড়ে উঠে। আগে অতো উন্নতমানের যন্ত্র ছিলো না।

বর্তমানে স্বয়ংক্রিয় মেশিনে সুচ তৈরি হয়। যে মেশিনে আপনা-আপনি কেটে-ছেঁটে, মসৃণ হয়ে অর্থাৎ ফিটফাট হয়ে আস্ত সুচটি বেরিয়ে আসে তাকে সুচের স্বয়ংক্রিয় মেশিন বলে। এবার দেখা যাক সুচ কয় প্রকার ও কিভাবে তৈরি হয়।

সোনামুখি সুচের কথা নিশ্চয়ই শুনেছো। অনেকে দেখেও থাকবে। এটি এক মিলিমিটারের চারভাগের এক ভাগ। সুচকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয়। তীক্ষ্ণ, ভোঁতা, ও মাঝারী। সেলাইকলের সুচকে একটু শক্ত হতে হয়। এটি কাস্ট আয়রন বা ঢালাই লোহা দিয়ে তৈরি। হোসিয়ারী কাজের সুচ তুলনামূলমভাবে নরম ইস্পাত দিয়ে তৈরি হয়। গেঞ্জী, জাঙিয়া ইত্যাদি হোসিয়ারী মিলে তৈরি হয়। ইস্পাতের গুণের উপর সূচের নমনীয়তা নির্ভর করে।

সার্জারী বা মানুষের কাটা-ছেঁড়া সেলাই করার সুচ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কাটা সেলাইয়ের জন্য যে সুচ ব্যবহার করা হয় সেটি আকৃতিতে বাঁকা। এটি তৈরি হয় উত্তম খাদ মেশানো বা শংকর ধাতু গঠিত ইস্পাত দিয়ে। ইনজেকশানের ফাঁফা সুচও এই ইস্পাত দিয়ে তৈরি হয়। তৈরির পদ্ধতি কি?

সুচ বানাতে ঝুট-ঝামেলা কম নয়। আমরা হাতে যে সুচ নিই এটিকে মেশিনে পনরটি স্তর পার হতে হয়। এ সবের প্রধান প্রধান স্তর সম্বন্ধে আলোচনা করা যাক।

প্রথমে ইস্পাতের তারকে দুটো সুচের দৈর্ঘ্যের সমান করে কাটা হয়। এরপর তারটিকে টেম্পারিং করা হয়। টেম্পারিং করা মানে এটিকে প্রয়োজনমতো পর্যায়ক্রমে শক্ত ও নমনীয় করানো। তারপর হীরকখণ্ডের মতো শক্ত কার্বোরাণ্ডাম পাথরের সাহায্যে তারের দুই প্রান্তকে সুচালো করা হয়।

সুচালো তারটির ঠিক মধ্যখানে একটি স্টাম্পযন্ত্রের সাহায্যে চাপ দিয়ে থেতলানো হয়। তারপর পাঞ্চ মেশিন থেতলানো যায়গায় পাশাপাশি দুটি ছিদ্রের সৃষ্টি করে। ছিদ্রটিকে সুচের 'চোখ' বলা হয়। চোখের দুপাশ থেতলানোর ফলে অমসৃণ থাকে। একে গ্রাউণ্ড মেশিনে মসৃণ করা হয়। পরে সুচকে বেশ গরম করে সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা তেলের মধ্যে ফেলতে হয়।

এরপর নীল আলোয় তাপ দিয়ে গরম করে আবার ঠাণ্ডা করতে হয়। গরম-ঠাণ্ডা, গরম-ঠাণ্ডা এভাবে কিছুক্ষণ করলে সুচ দৃঢ় ও নমনীয় হয়। শেষে ধোয়া, গড়ানো, পালিশ করা ইত্যাদিও করতে হয়। কোনো কোনো সময় সুচের উপর ইলেক্ট্রো-প্লেটিং প্রক্রিয়ায় অন্য ধাতুর আস্তরণ লাগানো হয়ে থাকে।

অতো ছোট সুচটিকে বানাতে কতো ঝামেলা দেখলে। ছোট হলে কি হবে। এই ছোট জিনিসটিও তো আমাদের দেশে তৈরি হয় না। বাজারে গিয়ে সবাই খোঁজে চীন-জাপানের সুচ। এ খবরটি আমাদের জন্যে গৌরবের নয়।

আজ এই সুচ মানষের পোশাক ও ফ্যাশানের জগতে বিপ্লব এনেছে। এক কথায় মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে সুচের অবদান কম নয়। কাজেই সব জায়গায় এর দর ও কদর বেশি। ছোট এই জিনিসটি আসলে কি ছোট?

লড়াই

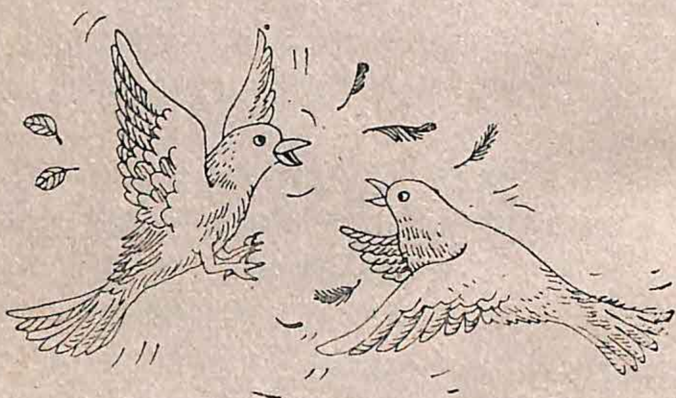
লড়াই। রাজ্যে-রাজ্যে লড়াই। রাজায়-প্রজায় লড়াই। প্রজায়-প্রজায় লড়াই। লড়াই বানরে-বানরে, কুকুরে-কুকুরে, মাছে-মাছে, কেঁচোয়-কেঁচোয়। কাক-চিলে লড়াই। বানরে-মানুষে, মানুষে-বাঘে, শিম্পাঞ্জী-গরিলায় লড়াই। সাপে-ব্যাঙে লড়াই, ব্যাঙে-মাছে লড়াই, পাখি-প্রজাপতিতে লড়াই। লড়াই, লড়াই লড়াই।

এত লড়াই কেন? লড়াই পেটের জন্যে। লড়াই মোটা হবার জন্যে। পেট খালি থাকলে মাথা গরম। সবারই। খাবার তো অফুরন্ত নয়। এ ছাড়া এক প্রাণী অন্য প্রাণীর খাবার ছিনিয়ে নেয়। এদের কেউ কেউ বেশী খেয়ে মোটা থাকতে চায়। এতে অন্যের খাবারে টান পড়ে। অনেকটা জোর যার মুল্লুক তার। যার গায়ে যতো শক্তি, সে ততো বেশি খাবার ছিনিয়ে নেয়।

খাবার তো জুটলো। মাথা গুঁজবে কোথায়। একটু বিশ্রাম দরকার। চাই আশ্রয়, চাই বাসস্থান। মানুষে-মানুষে ভিটেমাটির জন্যে কতো খুনখারাবি। নীচু প্রাণীরও বাসস্থান দরকার। এ নিয়ে তাদের মধ্যে যুদ্ধ। স্ত্রী, সন্তান নিয়ে একটা গর্তে সুখে দিন কাটাচ্ছিলো। বেলা শেষ ফিরে দেখলো, গর্ত বেদখল। মাথায় খুন চাপবে না?

স্ত্রী জাতীয় প্রাণীর শরীর একট দুর্বল। এরা বেশী ধকল সইতে পারে না। প্রকৃতিতে স্ত্রী প্রাণীর সংখ্যা পুরুষ প্রাণীর তুলনায় কম। হিসাবে দেখা যায়, কোনো কোনো দেশে পুরুষের চেয়ে নারীর সংখ্যা বেশী। এর কারণ অনেক। পুরুষ

যুদ্ধ করে বেশি। মরেও বেশি। কম সংখ্যক স্ত্রী জাতীয় প্রাণীর জন্যে বেশি সংখ্যক পুরুষ জাতির মধ্যে লড়াই। স্ত্রী প্রাণীর অধিকার আদায়ের লড়াইয়ে কেউ হারে, কেউ জেতে। এই লড়াই হয় একই প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে। স্ত্রী ব্যাঙকে পাবার জন্যে সাপের কোন মাথাব্যথা নেই। আবার, পুরুষ সোনা ব্যাঙ স্ত্রী কুনো ব্যাঙের জন্যে লড়াই করে না।



স্ত্রী জাতির অধিকারের লড়াইয়ে যোগ্য ও সবল প্রাণীটি জিতে যায়। এতে সবল বংশধরের সৃষ্টি হয়। মজা হলো, এ-লড়াইয়ে কেউ মরে না বা খুব বেশি আহতও হয় না। তাদের লড়াইয়ের একটা নীতি আছে। যেমন যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা। যে হেরে গেলো, সে কম স্বাস্থ্যবান বলেই হারলো না। আসলে বেশি বয়স্কের কাছে কম বয়স্ক হারে। বেশি অভিজ্ঞতার কাছে হারে কম অভিজ্ঞতা। কারণ, দেহ তো সবার পরিপক্ক হয় না, বদ্ধিও সবার সমান নয়। বেশি বয়স্কের আঘাত কম বয়স্ক সইবে কেমন করে? এসব কথা নীচু প্রাণীদের নিয়ে বলা। মানুষের ক্ষেত্রে সবল ও যোগ্য পুরুষ হলেই বর্তমানে এ ধরনের লড়াইয়ে জেতে না। অনেক হাজার বছর আগে

হয়তো জিততো। এখন জিততে হলে বিদ্যাবুদ্ধি, অর্থবিত্ত, প্রতিপত্তি, ঐতিহ্য, এমনি আরো কতো কি দরকার!

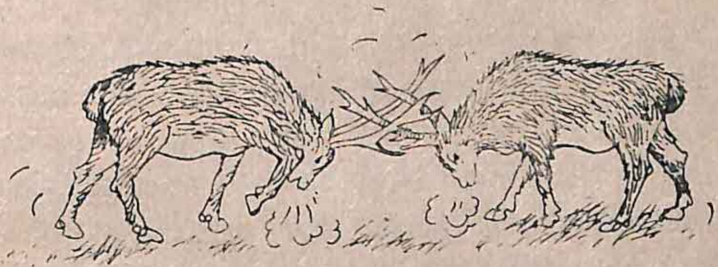
মোট কথা, খাদ্য, বাসস্থান; স্ত্রী জাতি নিয়ে লড়াই চলছে। বিভিন্ন প্রাণীর লড়াইয়ের কৌশল আর ধরন কিন্তু আলাদা। এদের লড়াইয়ের অস্ত্রও ভিন্ন ভিন্ন। কুকুর, হাঁস ও এক ধরনের মাছ লড়াই করে মুখ দিয়ে। মানে, কামড়াকামড়ি। খুরওয়ালা প্রাণী—যেমন ঘোড়া,—পেছনের পা দিয়ে শত্রু তাড়ায়। পেছনের পায়ে এদের ভীষণ জোর। লাথি মেরেই কুপোকাৎ করে। গরু, মোষ, হরিণ শক্তি যাচাই করে শিং দিয়ে। এখানে ঠেলাঠেলি যুদ্ধ। শিং দিয়ে ঠেলে যে যাকে যত পেছনে নিয়ে যেতে পারে, তারই জিত। পুচ্ছ-যুদ্ধ চালায় কিছু মাছ। লেজ দিয়ে পানিতে ঢেউ তুলে এই যুদ্ধ। রবিন মাছ তো তার লাল বুক দেখিয়ে শত্রুর মনে ভয় ধরায়। চিকলিড মাছ কানকো ফুলিয়ে সংহার মূর্তি ধরে। বাঘ জাতীয় প্রাণী তাদের দেহের এক প্রকার গ্রন্থি-রস গাছে-বাঁশে লাগিয়ে রেখে তাদের সীমানা জানিয়ে দেয়। খবরদার, সীমানার ভিতরে গেলেই মরণ। হায়েনা, কৃষ্ণসার হরিণ ও নকুল জাতীয় প্রাণীও তাদের শত্রুকে যেখানে পাওয়া যাবে, সেখানে গ্রন্থিরস ছিটিয়ে রাখবে। এতে জায়গাটি শনাক্ত করতে সবিধা হয়। বাদামী ভালুক শত্রুকে দেখলে গাছে পিঠ ঘষে এবং অনবরত প্রস্রাব করতে থাকে। এতে শত্রু ভড়কে যায়। কোন কোন জানোয়ার শব্দ-অস্ত্র ব্যবহার করে। বিরাট আওয়াজ শত্রুর বুকে কাঁপন ধরায়।

আগেই বলেছি, স্ত্রী জাতীয় প্রাণীর অধিকার নিয়ে লড়াই বাধে একই প্রজাতির প্রাণীর মধ্যে। কখনো একারণে যুগপৎ পুরুষ ও স্ত্রী জাতি লড়াই করে। এ লড়াই স্ত্রী প্রাণী-স্ত্রী প্রাণীতেও হয়। কোনো কোনো প্রজাতির পাখিতে শুধু স্ত্রী প্রাণীই

লড়াই করে। তবে এ লড়াই দীর্ঘস্থায়ী নয় এবং পরিণতিও ভয়াবহ নয়। বিটারলিং নামক পুরুষ মাছ একটি শামুকের চারপাশ পাহারা দেয়; যাতে অন্য স্বগোত্রীয় পুরুষ মাছ ধারেকাছে আসতে না পারে। স্ত্রী মাছকে এরা শামুকের খোলসে ডিম পাড়বার জন্যে উত্তেজিত করে। বিবরবাসী পাখি বিবর বেদখলের উদ্দেশ্যে আসা বজ্জাত পাখির বিরুদ্ধে ভয়াবহ ভঙ্গিতে রুখে দাঁড়ায়।

ইগুয়ানার যুদ্ধকাহিনী বড়ই মজার। ইগুয়ানা টিকটিকি বা গিরগিটি জাতীয় প্রাণী। বিবর্তনবাদের জনক চার্লস ডারইউন গ্যালাপাগোস দ্বীপে এদের প্রথম দেখেন এবং এদের নিয়ে গবেষণা করেন। এরা সমুদ্রেও যায় এবং জলজ উদ্ভিদ খায়। প্রজনন ঋতুতে ইগুয়ানা একটি রাজ্য দখল করে। রাজ্যের পরিধি পাথরের কয়েক গজ তো হবে। সে রাজ্যে তিন-চারটি রানী থাকে। রাজা ও রানীরা সুখে দিন কাটায়। প্রায়ই অন্য পুরুষ ইগুয়ানা তাদের রাজ্যে হানা দেয়। রাজা তখন চমৎকার কৌশল নেয়। তার পিটের পাখনাকে একেবারে খাড়া করে তুলে দেহকে একটু ফাঁপায়। এতে সে যা নয়, তার চেয়ে তাকে অনেক বড় দেখায়। এরপরও পোজপাজ করে যেন হাঁ করে গিলতে যাবে। হাঁ করে, মাথা নামিয়ে, তীরবেগে ছোটার ভঙ্গি করে। ত্যাঁদোড় প্রতিপক্ষ যদি এতেও সরে না যায়, তাহলে যুদ্ধ অনিবার্য। রাজা মাথা নীচু করে ধাওয়া করল। বিপক্ষও মাথা দিয়ে আঘাত ঠেকাল। মাথায়-মাথায় যুদ্ধ। যে যাকে ঠেলে পেছনে নিয়ে যেতে পারে। রানীরা নির্বাক দর্শক। লড়াই তখনই শেষ যখন এক পক্ষ আত্মসমর্পণের ভঙ্গিতে পেটের উপর ভর দিয়ে শুয়ে পড়ে। সারেণ্ডার করলে তখুনি সাতখুন মাপ। আর আঘাত নয়। বিজয়ী দর্পিত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকে, যতক্ষণ বিজিত সরে না যায়। রাজ্য ও রানী তখন বিজয়ীর অধিকারে আসে।

চিকলিড মাছেও এ ধরনের লড়াই দেখা যায়। এরা লেজ দিয়ে পানিতে ঢেউ তুলে পরস্পরকে আঘাত করে। এতে জয়-পরাজয় মীমাংসা না হলে একে অপরের ঠোঁট কামড়ে ধরে। একে অপরকে সামনে পেছনে টানাটানি করে। বিজিত পাখনা গুটালে বোঝা যাবে, সে হার মেনে নিলো। লড়াই শেষ। বিজিত পালায়।



মারাত্মক অস্ত্র থাকলে অবশ্য এ লড়াই মর্মান্তিক হয়। র‍্যাটল সাপ বা গোখরো সাপ এক ছোবলেই বিপক্ষের প্রাণ-নাশ করে। তবে অন্যান্য সাপের লড়াই মজার। তারা দেহের এক-তৃতীয়াংশকে খাড়া করে পরস্পরকে মাথা দিয়ে ঠেলে পাশে নেতিয়ে ফেলার চেষ্টা করে। অনেকটা পাঞ্জা কষার মত। বিজয়ী সাপ কিছু সময়ের জন্যে তার দেহের সমস্ত ভার বিজিতের উপর চাপিয়ে দেয় এবং পরে বিজিতকে পালানোর সুযোগ করে দেয়।

নীচু প্রাণীরা শুধু নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্যে যুদ্ধ করে না। কেউ কেউ সবার স্বার্থে ও ভবিষ্যৎ বংধরের স্বার্থে আত্মদানও করে থাকে। মৌচাক ভাঙার দৃশ্য অনেকেই দেখে থাকবে। মৌচাক আক্রমণকারী ভালুক বা মানুষকে তাড়ানোর জন্যে অসংখ্য কর্মী মৌমাছি জীবন আহুতি দেয়।

এরই পাশাপাশি আরেক ধরনের হিংস্রতার ঘটনা উল্লেখ করা যায়। হনুমান জাতীয় নর-বানর যখন নূতন দলের নেতৃত্ব অর্জন করে, তখন পুরনো দলভুক্ত তার বংশের সবাইকে মেরে সাবাড় করে দেয়। নেতার মাছুম বাচ্চাও তার হাত থেকে রেহাই পায় না। ভবিষ্যতে তার বংশের কেউ যেন তার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে না পারে, তাই আগে থেকে সতর্কতামূলক এই ব্যবস্থা।

লড়াইয়ে ছলনাও একটি অস্ত্র বটে। তিন-কাঁটা স্টীকলব্যাক মাছ লড়াইয়ে ছলনার আশ্রয় নেয়। প্রথমে সে যে জোয়ান মর্দ, তা জাহির করে লাল পেট দেখিয়ে। লাল পেট দেখিয়ে সে স্ত্রী মাছকে প্রলোভন দেখায়। এসব মাছ বালি দিয়ে বাসা বানায় এবং বালির ঘরেই থাকে। স্ত্রী মাছ বাসায় ডিম পাড়ে। পুরুষ মাছ সে সব ডিমকে নিষেক করে এবং বাচ্চার যত্ন নেয়। পুরুষ মাছের স্বভাব হলো, সে অনেক স্ত্রী মাছের সাথে মিলিত হতে চায়। দেখা যায়, বাসার আশেপাশে ভ্রমণরত আরেকটি স্ত্রী মাছকে সে সাদর আহবান জানায়। ভ্রমণরত স্ত্রী মাছও সানন্দে বাসায় আসে এবং ডিম পাড়ার ভাণ করে। আসলে এটি একটি নকল স্ত্রী মাছ। পুরুষ মাছ লাল পেটটিকে আড়াল করে স্ত্রী মাছ সাজে। বাসায় ঢুকে সে স্ত্রী মাছের পাড়া ডিমকে নিষেক করে চলে যায়। বোকা পুরুষ মাছটি বিজয়দর্পে ঘুরে ফেরে এবং নকল স্ত্রী মাছ দ্বারা নিষেক করা ডিমকে আবার নিষেকের নিষ্ফল চেষ্টা চালায়।

মানুষ গরু, মোষ, মুরগী ইত্যাদির লড়াইয়ের আয়োজন করে। এসব সখের লড়াই। এতে অনেক সময় নিরীহ পশুপাখির প্রাণনাশ ঘটে। হাস্যকর লড়াই হলো ছাগলের। যে ভঙ্গিতে তারা লড়াই করে, তাতে মনে হয়, ফাটাফাটি

হয়ে যাবে। আসলে, একে অপরের মাথা ছোঁয় মাত্র। যেন চুমু খেয়ে গেল।

মানুষের লড়াইয়ের কথা কি আর বলব! সে সব তো সবার জানা। একদিন মানুষ দেহ দিয়ে লড়াই চালাতো। আজ মগজের যুদ্ধই প্রধান। সুইচ টিপলেই ওয়াশিংটন, মস্কো, পিকিং ধুলিস্যাৎ। সভ্য মানুষ নিজেদের রক্ষার জন্যে আইন বানিয়েছে। তবে এ সব আইনও যার যেমন স্বার্থে আসে, তেমন করেই বানানো। সবচেয়ে দুঃখের কথা, নীচু প্রাণী বিজিতকে, আত্মসমর্পণকারীকে মুহূর্তেই ক্ষমা করে দেয়, তার প্রাণ নেয় না, কিন্তু মানুষ অনেক সময় মানুষকে ক্ষমা করে না। প্রতিপক্ষকে শেষ করার চেষ্টা চালায়। মানুষের লড়াই সবচেয়ে ভয়াবহ। এখানে নীতির বালাই কম। অথচ মানুষ সভ্যতার বড়াই করে।

লড়াইয়ের শেষ কবে? মনে হয় শেষ নেই। অবশ্য, লড়াই ছাড়া এগুনোও যায় না। জলে, ডাঙ্গায়, আকাশে এ লড়াই চলছে, চলবে। পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের মাতব্বরি থেকে দূরে সরে যাবার চেষ্টায়। সূর্য পৃথিবীকে আগলাচ্ছে। চন্দ্র চায় পৃথিবীর বাঁধন থেকে মুক্ত হতে। পৃথিবী তাতে নারাজ। সূর্য ও তার সৌররাজ্যকে নাকে রশি দিয়ে ঘোরাচ্ছে আরেক নক্ষত্র বা বড় সূর্য। এ টানাপোড়েন না থাকলে তো গতি স্তব্ধ হয়ে যেতো।

একটি মানুষ লক্ষ লক্ষ জীবাণুর সাথে প্রতি মুহূর্তে লড়াই করে বেঁচে আছে, এগিয়ে যাচ্ছে। মানুষ লড়াই করছে প্রকৃতির আলো, তাপ, হাওয়ার বিরুদ্ধে পলে পলে। তাতে তার শক্তি বাড়ছে। তেমনি উদ্ভিদে-উদ্ভিদে লড়াই, উদ্ভিদে-প্রাণীতে লড়াই, উদ্ভিদে-পরিবেশে লড়াই চলছে।

শেষ কথা হলো, লড়াই যতই তুঙ্গে উঠুক না কেন, এতে চূড়ান্ত ধ্বংসের কোন সম্ভাবনা নেই। প্রকৃতির এমনই ব্যবস্থা, তাতে সব শেষ হবার জো নেই। কিছু না কিছু টিকে থাক-বেই। লড়াই জীবনের চিহ্ন। জীবন থাকলে লড়াই থাকবে। লড়াইয়ের মাধ্যমে জীবন বিকশিত হবে। জীবন গতিবেগ পাবে। মানুষের মতো ' সর্বশ্রেষ্ঠ জীবের" জন্যে শুধ দরকার, এ লড়াইকে সৃষ্টির কাজে লাগানো, ধ্বংসের কাজে নয়।

ডলফিন হায় ডলফিন

গ্রীস দেশের পুরাণ-কাহিনী। গ্রীকবীর অডিয়ুসের ছেলে টেলিম্যাকাস। সমুদ্রযাত্রায় টেলিম্যাকাস একবার সমুদ্রে পড়ে যায়। গভীর সমুদ্র। টেলিম্যাকাসের বাঁচার কোনো আশা নেই। কিন্তু টেলিম্যাকাস সেবার বেঁচে গেলো। বাঁচালো একটি ডলফিন। ডলফিন টেলিম্যাকাসকে পিঠে বয়ে তীরে পেঁাছে দিয়েছিলো। ডলফিনের প্রতি অডিয়ুসের মন কৃতজ্ঞতায় ভরে গেলো। অডিয়ুস জীবনভর ডলফিনের চিত্র তাঁর বর্মে খোদাই করে রেখেছিলেন।

বিজ্ঞানী প্লিনিও ডলফিন সম্বন্ধে আশ্চর্য এক ঘটনার বর্ণনা রেখে গেছেন। ছোট্ট একটি ছেলে। হ্রদের পাড় দিয়ে সে অনেক



দূর হেঁটে স্কুলে যেতো। এতে তার খুব কষ্ট হতো। হাঁটতে হাঁটতে ছেলেটি ক্লান্ত হয়ে পড়তো। একদিন সবাই দেখলো

ছেলেটি একটি ডলফিনের পিঠে চড়ে হ্রদটিকে সোজা পাড়ি দিচ্ছে। কী অবাক কাণ্ড! ছেলেটি স্কুল থেকে ফেরার সময় দেখা যেতো ডলফিন তার জন্য অপেক্ষা করছে এবং অঙ্গ-ভঙ্গী করে তাকে ডাকছে। ছেলে আবার তার পিঠে চড়ে বাড়ী ফিরতো।

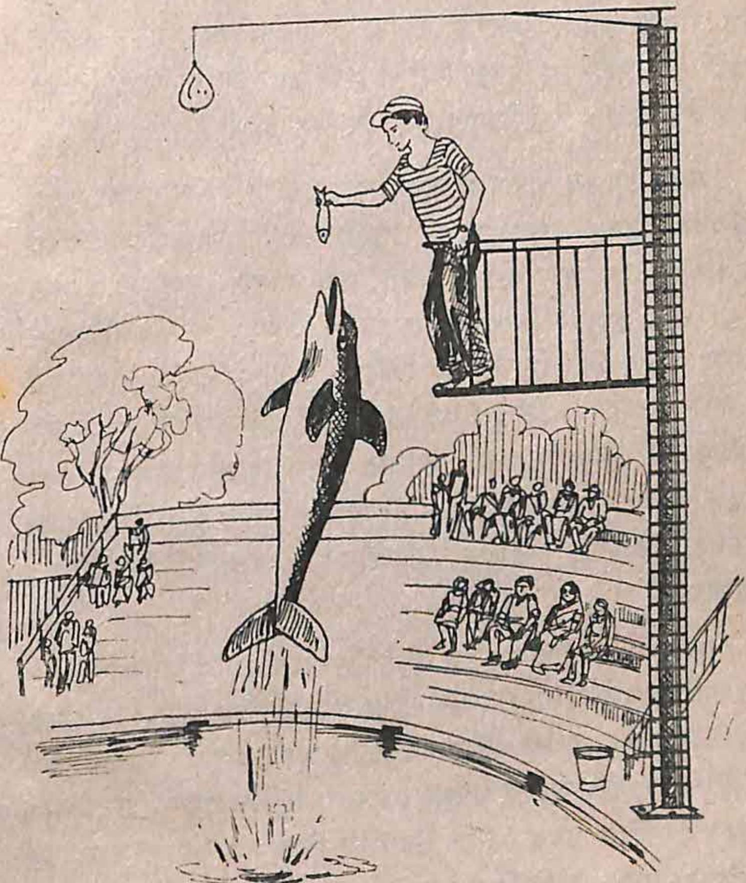
ডলফিন ছোট ছেলেটির কণ্ঠ কীভাবে বুঝতে পারতো বা স্কুল-শেষের সময় কীভাবে পরিমাপ করতো তা জানা যায় নি। তবে এসব গল্প যে আষাঢ়ে নয় তার বহু প্রমাণ আছে।

ডলফিন খুব বুদ্ধিমান প্রাণী। জলচর প্রাণীদের মধ্যে সব-চেয়ে বুদ্ধিমান। ডলফিন পোষ মানে। এরা সার্কাস দেখাতে পারে। সার্কাসের জীবজন্তুর মতো ওরা লোহার রিং-এর ভিতর দিয়ে দেহ গলাতে পারে। শব্দের সংকেত বুঝতে পারে। এদের আবেগ, অনুভূতি আছে এবং সেসব প্রকাশও করে অপরূপ ভঙ্গীতে। ডলফিনের ভাষা নিয়ে অনেকে গবেষণা করেছেন ও করছেন। বিজ্ঞানী সিসিলি তাদের প্রকাশের ভাষা যে আছে এ নিয়ে দৃঢ় মত পোষণ করেন।

দার্শনিক অ্যারিস্টটলও ডলফিনের পরোপকার বিষয়ে অনেক ঘটনার উল্লেখ করেছেন। ডলফিন নাবিকদের বিশ্বস্ত বন্ধু। হাজার হাজার বছর ধরে ডলফিন সমুদ্রে দিশেহারা নাবিককে পথের দিশা দেখিয়েছে। সমুদ্র-গভীরে মগ্ন ওৎ পেতে থাকা পর্বত ও দ্বীপের সাথে সংঘাত থেকে অসংখ্য জাহাজ ও নৌযানকে বাঁচিয়েছে।

ডলফিন স্তন্যপায়ী প্রাণী। অর্থাৎ এরা মায়ের স্তন চুষে দুধ পান করে এবং মানবশিশুর মতো একটি নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত এই দুধ পান করেই জীবনধারণ করে। মানুষ, বানর, শিম্পাঞ্জী, কুকুর, বিড়াল, ঘোড়া ইত্যাদি প্রাণী স্তন্যপায়ী।

স্তন্যপায়ী ও পক্ষীজাতীয় প্রাণীদের উষ্ণশোণিত প্রাণীও বলা হয়। কারণ এদের দেহে অক্সিজেন-যুক্ত ও অক্সিজেন-শূন্য রক্তের মিশ্রণ ঘটে না। যেহেতু এদের হৃৎপিণ্ডে স্পষ্ট ভাগ করা



চারটি প্রকোষ্ঠ রয়েছে। এক পাশের দুই প্রকোষ্ঠে সারা শরীর থেকে বয়ে আনা অক্সিজেন-শূন্য রক্ত জমা হয় ও পরে তা অক্সিজেন-যুক্ত হবার জন্য ফুসফুসে যায়। ফুসফুস থেকে

অক্সিজেন-যুক্ত রক্ত হৃৎপিণ্ডের অপর প্রকোষ্ঠদ্বয়ে আসে এবং সেখান থেকে তা সারা দেহে সঞ্চালিত হয়। ফলে দেহ একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রা রক্ষা করতে পারে। পরিবেশের তাপমাত্রার উঠতি-পড়তি হলেও দেহ তাপের ভারসাম্য রক্ষা করতে সমর্থ হয়। কিন্তু ব্যাঙ, সাপের দেহে তা সম্ভব হয় না। এদের হৃৎপিণ্ড চারটি প্রকোষ্টে বিভক্ত নয় এবং দেহে মিশ্রিত রক্ত সঞ্চালিত হয়। ডলফিনও উষ্ণ-শোণিত প্রাণী।

দেহে তাপের ভারসাম্য রক্ষার জন্যে ত্বকের উপরে লোমেরও ভূমিকা আছে। লোম তাপ অপরিবাহী। স্তন্যপায়ীদের দেহ সাধারণত লোমে ঢাকা। কিন্তু ডলফিনের দেহ লোমাবৃত নয়। পূর্বে হয়তো এদের শরীরে লোম ছিলো। পানির পরিবেশে লোম অকার্যকর। এ কারণে লোমের বিলুপ্তি ঘটেছে। লোমের বিকল্প ব্লাবার। ত্বকের নীচে এক স্তর চর্বির সৃষ্টি হয়। এই চর্বিস্তরের নাম ব্লাবার। ব্লাবার দেহে তাপের সমতা রক্ষা করে। জলচর অন্যান্য স্তন্যপায়ী যথা তিমি, শুশুক, সমদ্র গাভী (ডগং) ইত্যাদির শরীরও লোমহীন। এদের শরীরেও ব্লাবার রয়েছে।

স্তন্যপায়ীদের অপর এক বৈশিষ্ট্য হলো এরা মাছ, ব্যাঙ, সাপ ও পাখির মতো ডিম পাড়ে না। ওদের দেহে ডিম দেহের ভিতরেই নিষিক্ত হয়। সন্তান দেহের ভিতরে পূর্ণতা পায়। নবজাতক নির্দিষ্ট সময়ে মায়ের জঠর থেকে প্রসবিত হয়। ডলফিনও এভাবে সন্তান প্রসব করে। ডলফিন-শিশু ১০-১২ মাস মায়ের জঠরে থাকে। মানবশিশু থাকে ৯-১০ মাস। ডলফিন একবারে একটি বাচ্চা দেয়। ডলফিন-শিশুও মানবশিশুর মতো যত্ন-আত্তি পায়। শিশু গর্ভে থাকার সময় মাসীরা মায়ের সেবাযত্ন করে। প্রসবের পর মাসী বোন-ঝি বা বোন-পো-কে নিয়ে দ্রুত

ডাঙ্গার দিকে নিয়ে যায় এবং স্বচ্ছন্দ শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে সাহায্য করে। মাসীরা শিশুকে পাহাড়া দেয় এবং মায়ের দুধ-পানে সহায়তা দান করে। ডলফিনের দুধ খবই পুষ্টিকর। মায়ের চেয়ে যে মাসীর দরদ বেশি তা ডলফিনের ক্ষেত্রেই প্রমাণিত।

ধারণা করা হচ্ছে, প্রায় পাঁচ থেকে সাত কোটি বছর আগে ডাঙ্গার কিছু প্রাণী স্বেচ্ছানির্বাসনে সমুদ্রের জলে যেতে বাধ্য হয়েছিলো। এরকমটি তিন কারণে হতে পারে। এক, কোনো এক সময়ে পৃথিবীর প্রতিবেশ ও পরিবেশ তাদের অস্তিত্ব রক্ষার পক্ষে হুমকী হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। দুই, ডাঙ্গায় খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছিলো। তিন, ডাঙ্গার অন্যান্য প্রাণীদের সাথে সংগ্রামে পরাস্ত হয়েছিলো। তা যা হোক এরা যে একদা ডাঙ্গায় বিচরণ করতো সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গে তার ছাপ এখনো স্পষ্ট। এরা ডাঙ্গায় লোমশ, লেজবিশিষ্ট চতুষ্পদী প্রাণী ছিলো বলেই সবার বিশ্বাস।

ডলফিনের পূর্বেকার লেজ রূপান্তরিত হয়ে মাছের লেঝের অনুরূপ হয়েছে। বলাবাহুল্য, প্রাণী যে পরিবেশে থাকে তার সাথে অভিযোজনের প্রয়োজনে তাদের অঙ্গের গড়ন প্রয়োজন-মাফিক গড়ে উঠে। ডলফিনের সামনের পা দুটি পাখনায় পরিণত হয়েছে। লক্ষ্য করা যায়, এ পাখনা ও মাছের পাখনায় আকাশ-পাতাল তফাৎ রয়েছে। আবার ডলফিনের পাখনায় পাঁচ আঙ্গুলের নমুনা এখনো স্পষ্ট। পেছনের পা দুটো বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

নাকের ছিদ্র মাথার উপরে স্থানান্তরিত হয়েছে। কারণ এতে জলপৃষ্ঠে ভাসমান থাকা অবস্থায় এরা বাতাস থেকে সহজে অক্সিজেন সংগ্রহ করতে পারে। নাকের ছিদ্র ফুসফুসের সাথে সরাসরি যুক্ত থাকে। ডলফিনের শ্বাস-প্রশ্বাস-ক্রিয়া একটু

অন্য ধরনের। আমরা মিনিটে ১২-১৬ বার শ্বাস নেই। ডলফিন নেয় ২/৩ বার। মানুষের পেশীকোষে গৃহীত অক্সিজেনের শতকরা তের ভাগ জমা পড়ে। ডলফিনের পেশীকোষে জমা পড়ে শতকরা ৪০ ভাগ অক্সিজেন। এই বাড়তি অক্সিজেন ডলফিনকে অধিক সময় পানির নীচে ডুবে থাকায় সাহায্য করে।



অকস্মাৎ পানির গভীরে ডুব দিলে রক্তচাপ বাড়ে। এমনিতেও পানির গভীরে থাকলে দেহের উপর পানির চাপ পড়ে এবং এর প্রতিক্রিয়া দেহে নানাভাবে হতে থাকে। বিশেষ করে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এ চাপ একটা ভয়াবহ সমস্যা। কিন্তু ডলফিনের রক্তনালীতে দ্বিমুখী রক্ত চলাচল করতে পারে। আমাদের ধমনী ও শিরা দিয়ে একমুখী রক্ত প্রবাহিত হয়। কিন্তু এর ক্ষেত্রে উভয়দিকে রক্ত চলাচল করে থাকে। ডুব দেবার সময় ডলফিনের শ্বাসনল ও নাসারন্ধ্র স্বতস্ফূর্তভাবে বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ করে এক ধরনের ভালব বা কপাটিকা।

ডলফিনের চোখ দেহের আকারের তুলনায় ছোট। দৃষ্টি-শক্তিও কম। বহির্কর্ণ লুপ্ত। অন্তর্কর্ণ মানুষের

অন্ডর্কর্নের অনুরূপ। এদের ঘ্রাণশক্তি সম্বন্ধে বিশেষ জানা যায় নি। ডলফিনের মগজ আকারে মানুষের মগজ থেকে বড়। সম্ভবত বিশাল মগজের কারণেই এরা তুখোড় বুদ্ধিমান।

ডলফিন গলা দিয়ে বিচিত্র শব্দ করে যা মানুষের বোধগম্য নয়। গলার শব্দ সমুদ্রের গভীরে নানা জিনিসে বা মাছের গায়ে ধাক্কা খেয়ে তার কানে ফিরে আসে। শব্দ কিসে ধাক্কা পেলো এবং কতো দূরে ধাক্কা লাগলো সে চট করে বুঝতে পারে। ডলফিন এ পদ্ধতির মাধ্যমে শিকার ও শত্রুর সন্ধান পেয়ে থাকে।

তিমি, ডলফিন, শুশুক। ডলফিনের আরেক নাম দাঁতাল তিমি। বোঝা যাচ্ছে তিমির সাথে ডলফিনের অনেক মিল রয়েছে। তিমি ও ডলফিন একই বর্গভুক্ত প্রাণী। এই বর্গটির নাম সিটাসিয়া। তিমিরই একটি প্রজাতি থেকে ডলফিনের উদ্ভব। প্রজাতির নাম ওড়োন্টোসেটি। এরা দাঁতবিশিষ্ট তিমি। ওডোন্টোসেটির উত্তরসূরী হলো ডলফিন। দাঁতবিশিষ্ট তিমির দলে রয়েছে খুনী তিমি, পাইলট তিমি। খুনীর বংশে সাধু ডলফিনের উদ্ভব খুবই অবাক করার মতো বটে।

অঙ্গের বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে শুশুক ডলফিনের নিকট-তম আত্মীয়। শুশুক স্তন্যপায়ী। এরা প্ল্যাটিনিসটোইডিয়া বর্গের অন্তর্ভুক্ত। শুশুকের সাথে ডলফিনের মূল পার্থক্য মুখমণ্ডলের। শুশুকের মখ ভোঁতা ও চ্যাপ্টা। ডলফিনের মুখ হাঁসের চঞ্চুর মতো।

ডলফিনের অনেক ক'টি গোষ্ঠি আছে। সংখ্যায় সবচেয়ে বেশী হলো ডেলফিনাস ডেলফিস। এদের পৃষ্ঠদেশ কালচে রঙের। পেটের তলা বা উদরদেশ শাদাটে। দেহের অন্যান্য অংশে চমৎকার চিত্রবিচিত্র বর্ণের সমাবেশ ঘটে। এরা দৈর্ঘ্যে

প্রায় দু'হাত। জাহাজের আশেপাশে ডেলফিনাস ডেলফিসরাই বেশী থাকে।

বোতল-নাসা ডলফিন আরেক গোষ্ঠিভুক্ত। এদের পৃষ্ঠ-দেশের বর্ণ ধূসর, উদরদেশ শাদা। লম্বায় প্রায় দুহাত।

তৃতীয় গোষ্ঠির ডলফিনের নাম রিসোর ডলফিন। এদের মুখ খুব ছোট। দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩-৩½ হাত। দেহের বর্ণ নীলচে শাদা। এর উপর কখনো-সখনো হলুদ ও গোলাপী রঙের ফোঁটা থাকে। এক রিসোর ডলফিন ২৪ বছর পৃথিবীর মানুষের সেবা করে গেছে। ডলফিনটির নাম পেলোরাম জ্যাক। জ্যাক ১৮৮৮ সাল থেকে ১৯১২ সাল পর্যন্ত কুক স্ট্রেট ও নিউ-জিল্যাণ্ডের মধ্যবর্তী সমুদ্রে চলাচলকারী জাহাজসমূহকে পথ নির্দেশ করতো। একবার পথ না দেখানোতে একটি জাহাজ বিপদে পড়ে ও দুর্ঘটনার শিকার হয়।

ডলফিন দলবদ্ধভাবে থাকা পছন্দ করে। এরা আবেগ-প্রবণ, স্ফূর্তিবাজ ও সঙ্গপ্রিয়। হৈ হুল্লোড় তাদের ভারী প্রিয়। মানুষের সঙ্গ পেতেই তারা অধিক আগ্রহী। তাকে একলা বন্দী করে রাখলে সে সারাক্ষণ মনমরা হয়ে থাকে। খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দেয়। এভাবে সে অনশনে আত্মহত্যা করে। কিন্তু মানুষের সঙ্গ পেলে সে খুব সতেজ থাকে।

ডলফিনের অন্যতম প্রধান খাদ্য সামুদ্রিক মাছ। মাছের ঝাঁকের ভিতর বা ঝাঁকের কাছে এরা ঘুরে বেড়ায়। মাছ শিকারের সময় ওরাও জালে আটকা পড়ে। এভাবে প্রতি বছর অসংখ্য ডলফিন জেলেদের হাতে মারা পড়ে। একমাত্র আমেরিকাতে প্রতি বছর লক্ষাধিক ডলফিনের জীবননাশ হয়। ১৯৭২ সালে আমেরিকায় ডলফিন হত্যার বিরুদ্ধে আইন পাশ হয়। কানাডাতেও অনুরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হয়। কিন্তু

বিবেকহীন লোভাতুর মানুষ সেসব আইনকে বুড়ো আঙ্গুল দেখিয়ে যাচ্ছে। ফলে ডলফিন-নিধন চলছেই। অবিবেচক মানুষ বুদ্ধিমান এ প্রাণীসমূহকে বিলুপ্ত করে দেবে এ আশঙ্কা অমূলক নয়।

কোনো এক সময় অসহায় এই প্রাণী নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদে সমদ্রের বৈরী পরিবেশকে আলিঙ্গন করতে বাধ্য হয়েছিলো। আজ সেখানেও তাদের নিস্তার নেই। ডাঙ্গার অতি উন্নত প্রাণীর লকলকে জিহ্বা সমদ্রের গভীরে অবিরাম হানা দিচ্ছে।

ডলফিনদের আর আশ্রয় কোথায়?

প্রতিবেশীর গল্প

বাংলাদেশ থেকে চলা শুরু করা যাক। কোন্ দিকে যাবো! ভারতের উপর দিয়ে নেপাল, তিব্বত হয়ে চীন। চীন থেকে মঙ্গোলিয়া হয়ে ইউরোপ। ইউরোপ থেকে আমেরিকা। এর পর অস্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকা। ভ্রমণ আকাশপথে নয়। স্থল ও জল-পথে। স্থাবর-জঙ্গম পেরিয়ে। চড়াই-উৎরাই মাড়িয়ে। নাহলে প্রতিবেশী দেশ সম্পর্কে জানা যাবে না। কোনো দেশের তাপমাত্রা একটু বেশি, কোনোটার কম। তবে অসহনীয় কোথাও নয়। কোথাও শ্বাস নিতে, নিঃশ্বাস ফেলতে কষ্ট হয় নি। সব জায়গা অক্সিজেনে ভরপুর। এখানে যেমন হাঁটছি, ওখানেও তেমনি। কাত হয়ে পড়ি নি কোথাও, উপুড় হয়েও চলতে হয় নি।

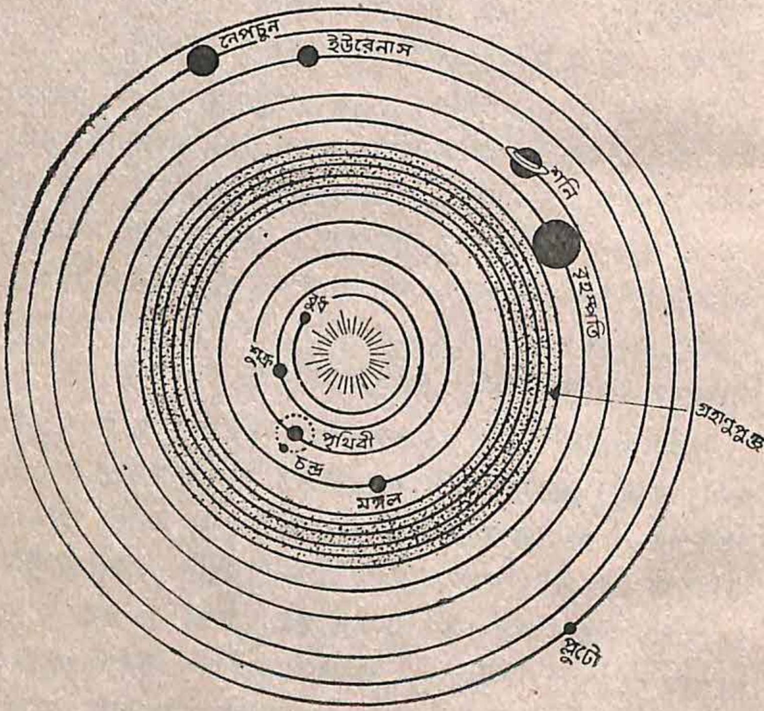
অথচ আমরা জানি পৃথিবীর আকৃতি গোল। এ-ও জানি পৃথিবী শূন্যে ঝুলে আছে। গোল পৃথিবীর নীচের দিকে গেলে পা মাটির দিকে ও মাথা শূন্যে ঝুলবে না? পড়ে যাব না? গোলকের পাশে গেলে কাত হয়ে পড়ে যাবার কথা। এতো দেশ হেঁটে এলাম, পৃথিবীর সব দিকে যাওয়া হলো, কোথাও এমনটি ঘটলো না। পৃথিবীর তুলনায় আমরা অতি ছোট বলেই কি? তা-ও হতে পারে। বড় লেবুর চারপাশে পিপঁড়া ছুটে বেড়ায়। পড়ে যায় না। ছোট হওয়ার জন্যে কি শুধু! বড় বড় গাছ-পালা, দালান-কোঠা, পাহাড়-পর্বতও ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। মহাশূন্যে হারিয়ে যায় না। বলতে পারো, এরাও পৃথিবীর তুলনায় কতো আর বড়। তা-ও বটে। কিন্তু আকাশের দিকে ছুঁড়ে দেওয়া ঢিল, আকাশে উড়ন্ত পাখি, এরোপ্লেন, ঘুড়িকে পৃথিবীতে নেমে আসতে হয় কেন? তারা তো মাটির মায়া ছাড়িয়ে পালিয়েছিলো।

হ্যাঁ, ফিরে আসতেই হবে। একটা নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে থাকলে ফিরতেই হবে। সবাইকে ফেরায়, টেনে রাখে পৃথিবীর মহাকর্ষবল। পৃথিবীর সাথে জীবজন্তু, মাটি, পানি এক কথায় সবকিছু মহাশূন্যে ঝুলে আছে। সবকিছুকে পৃথিবী আগলাচ্ছে। নাহলে কোথায় যে ছিটকে পড়তাম ভাবতেও গা শিউরে উঠে। আমাদের ধরে রেখেছে পৃথিবী, পৃথিবীকে ধরে রেখেছে কে? পৃথিবীও তো শূন্যে ঝুলছে। পৃথিবী অবিরাম ঘুরছে। ঘুরছে সূর্যকে কেন্দ্র করে সূর্যের চারপাশে।

তাহলে সূর্যই পৃথিবীকে টেনে রাখছে, ঘুরাচ্ছে। পৃথিবী নয় শুধু, সূর্যের আওতায় ঘুরছে মঙ্গল, বুধ, বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, নেপচুন, ইউরেনাস, প্লুটো ইত্যাদি গ্রহ এবং এসবের বহু উপগ্রহ। পৃথিবী-সহ গ্রহ-উপগ্রহ মিলে সৌর-পরিবার। পরিবারের সদস্যরা আপন আপন কক্ষপথে সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। কেউ কাছে, কেউ দূরে থেকে। কখনো তাদের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনা নেই। পরস্পরের দূরত্ব অনেক।

পৃথিবীর প্রতিবেশী গ্রহদের সম্বন্ধে আমাদের জানা অনেক কম। এতো দূরে যে দূরবীক্ষণযন্ত্র দিয়েও এদের দেখতে পাওয়া কষ্টসাধ্য। দেখতে মনে হয় ওরা যেন এক একটা নক্ষত্র। অথচ তা তো নয়। নক্ষত্রের আলো ও তাপ বিকিরণের ক্ষমতা থাকতেই হবে। যেমনটি সূর্য-নক্ষত্রের রয়েছে। এদের কারো আলো ও তাপ বিকিরণের ক্ষমতা নেই। আমরা আজো জানতে পারি নি এসব গ্রহের কোনোটাতে আমাদের মতো জীবজগৎ আছে কি না। ওদের জলহাওয়া ও পরিবেশ জীবনধারণের উপযোগী কি না। শুধু এটুকু জানি ওরা সূর্যের আকর্ষণে ঘুরছে। সূর্য থেকে কম-বেশি সবাই আলো ও তাপ পাচ্ছে।

ওদের সম্বন্ধে মানুষের জানার আগ্রহ অসীম। হাজার হোক প্রতিবেশী তো। এ নিয়ে মানুষের চেষ্টার অন্ত নেই। সেদিন মানুষ মহাশূন্যযানে চড়ে চাঁদে ঘুরে এলো। অনেক অভিজ্ঞতা হলো বটে কিন্তু হতাশও কম হলোনা। চাঁদে মানুষের বেঁচে থাকার মতো পরিবেশ নেই। এমনকি স্বচ্ছন্দে হা-ডুডু খেলারও উপায় নেই। চাঁদের মহাকর্ষ বল অনেক কম।



পৃথিবীতে লাফিয়ে যে ১০ ফুট উঠতে পারে সে চাঁদে ৬০ ফুট উঠে যাবে। লং জাম্পেও তাই। মহাশূন্যযান ভাইকিং মঙ্গলগ্রহে ঘুরে এলো। খুব স্পষ্ট ধারণা সংগ্রহ করতে পারে নি।

কী, মহাশূন্যযানে চড়ে প্রতিবেশী গ্রহে যাবার ইচ্ছে হচ্ছে নাকি? চড়ার আগে তোমাকে নানা কলা-কৌশল রপ্ত করতে হবে। নইলে পায়ে পায়ে বিপদ। পৃথিবীর মহাকর্ষ বল ছাড়িয়ে গেলে তোমার ও মহাশূন্যযানের কোনো ওজন নেই। মহাশূন্য-যানের যা ওজন তোমারও তাই। রিক্সা বা মিনিবাসে আরামে বসে, হেলেদুলে নিশ্চিন্তে যেমন চড়ে থাকো এখানে তেমনটি সম্ভব নয়। ওভাবে বসে থাকলে গ্যাস বেলুনের মতো মহা-শূন্যযানের খোলের মধ্যে ভাসতে থাকবে। শোয়া, বসা, ঘুমানো সব তাতেই সমস্যা। জিনিসপাতি নাড়াচাড়ায়ও সমস্যা। আলগা হলেই পেঁজা তুলোর মতো ফুরুৎ। পেঁজা তুলোর একটুখানি হলেও ওজন থাকে। তোমার তা-ও নেই। কোন জিনিসের না। পানি গিলবে কেমন করে। গলা দিয়ে তো নামবে না। মহাশূন্যযানে চড়ার আগে কি করে কি করতে হয় শিখে নাও। গ্রহে হেঁটে চলাফেরা করার কায়দা আছে। তাই শিখতেই হবে। অন্ততঃ কল্পনায় শিখে নাও।

ধরো, কল্পযানে চড়ে আমাদের যাত্রা হলো শুরু। প্রথমে কোন্ গ্রহে যাবো। বুধেই যাওয়া যাক। বুধ সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ। এর কাছাকাছি যাবার আগে তাপ-রোধি জামা-কাপড় পরে নিতে হবে। নয়তো পুড়ে গলে যাবে। সূর্যের খুব কাছে বলে বুধ তাপ পায় বেশি। ঐ তাপে সীসা গলে যায়। কল্পযানের বডিও তাপরোধি হওয়া চাই। অক্সিজেনের হেলমেট বা মুখোশ দরকার। দরকার অক্সিজেন ট্যাঙ্কও। ওখানে কণামাত্র অক্সিজেন নেই। হেলমেট, তাপরোধি স্যুট, অক্সিজেন ট্যাঙ্কের বোঝা খুব ভারী হবে মনে হচ্ছে? কোনো ভাবনা নেই। বুধের মহাকর্ষ বল খুব কম। কাজেই জিনিসের বা তোমার ওজন নেই বললেও চলে। তুমি অনায়াসে ত্রিশ ফুট লাফ দিয়ে

চলতে পারো। সঙ্গে পানি রাখতে ভুলো না। ওখানে সুন্দর হ্রদ বা প্রমত্তা নদী নেই। ৬০০ ডিগ্রী তাপমাত্রায় ওসব থাকবেই বা কি করে। ১০০ ডিগ্রী তাপমাত্রাতেই পানি হাওয়া হয়ে যায়। না এ গ্রহে টিকে থাকার উপায় নেই। চলো অন্য গ্রহে অন্য কোনোখানে।

বুধের পর শুক্র। শুক্র গ্রহকে আমরাই কিন্তু প্রথম দেখবো। আমাদের জন্য এখানে অনেক জানার বিষয় হয়তো বা জমা হয়ে আছে। পৃথিবীর মানুষ একে দেখতে পায় না। ঘন মেঘের আস্তরণ একে ঢেকে রেখেছে। এ মেঘ জলকণা দ্বারা সৃষ্ট নয়। বিষাক্ত গ্যাস জমাট বেঁধে তৈরি হয়েছে এই মেঘ। এখানে হিটপ্রুফ স্যুট বা তাপরোধি জামা-কাপড় পরার দরকার হয় তো পড়বে না। তাপমাত্রা পৃথিবীর মতো বলে ধারণা। অক্সিজেনের মুখোশ অবশ্যই পরতে হবে। মুখোশ, অক্সিজেন ট্যাঙ্ক ভারী লাগবে, কারণ এর মহাকর্ষ বলও পৃথিবীর অনুরূপ।

ভালো কথা, শুক্রগ্রহের সব খবর নোট করে নিতে ভুলো না। আর যতো পারো ছবি তুলবে। ফিরে গেলে পৃথিবীর মানুষ, সাংবাদিক ও বিজ্ঞানী এ গ্রহ সম্পর্কে জানার জন্যে ছেঁকে ধরবে। আমরাই এখানে প্রথম এলাম কি না। শুক্রে ইচ্ছে করলে কিছু দিন থাকতে পারো। খামোখা থেকে কী লাভ। অক্সিজেনের ভাণ্ডার কমবে। আরো অনেক গ্রহে যাওয়া বাকী।

শুক্রগ্রহ থেকে সরাসরি মঙ্গলগ্রহে যাবে, না, পৃথিবীতে নেমে মা, বাবা, ভাই বোনদের দেখে যাবে? শুক্রের পরই পৃথিবী। সময় নষ্ট করে লাভ কী। নিত্যদিনের দেখা পৃথিবীতে নতুন কি আর দেখবো।

সূর্যের চার নম্বর গ্রহটি সম্বন্ধে মানুষের আগ্রহ খুব বেশি। সৌর-পরিবারের এটিই দ্বিতীয় গ্রহ যেখানে প্রাণের অস্তিত্ব

আবিষ্কার করা যেতে পারে। মঙ্গল গ্রহের আরেক নাম নার-গ্যাল। কেউ কেউ একে লাল গ্রহ নামেও শনাক্ত করেন। সমরদেবতা নারগ্যালের নামানুসারে ব্যবিলনের জ্যোতির্বিদরা এর নাম দেন নারগ্যাল। সমর মানে শোণিতপাত। শোণিতের রং লাল। গ্রহটি দেখতেও লাল বর্ণের। জ্যোতির্বিদদের অনুমান মিথ্যা নয়। আমেরিকার মহাশূন্যযান ভাইকিং মঙ্গলকে লাল দেখা যাওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করেছে। মঙ্গলে লোহা জাতীয় পদার্থ ও জলীয় বাষ্পের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটার ফলে লাল রঙের সৃষ্টি হয়।

মঙ্গলের আবহাওয়ায় সম্ভবতঃ কিছু পরিমাণ অক্সিজেন ও জলকণা আছে। তবু সাবধান থাকা ভালো। অক্সিজেন মুখোশ সাথে রাখো। তাপরোধি স্যুট পরার দরকার নেই। এর তাপমাত্রা পৃথিবীর তাপমাত্রার কাছাকাছি। বিজ্ঞানীরা পৃথিবী থেকে মঙ্গলের দুই মেরুতে শাদা শাদা কি যেন দেখতে পান। গ্রীষ্মকালে এগুলি ক্রমশঃ আয়তনে কমতে থাকে এবং শেষা-বধি অদৃশ্য হয়ে যায়। এতে তাঁদের দৃঢ় ধারণা শাদা বস্তু তুষারই হবে। তুষার গলে গলে জলকণায় পরিণত হতে পারে। নদী, সমুদ্র হওয়া হয়তো সম্ভব। বিজ্ঞানীরা মাঝে মাঝে এর গায়ে আবছা সবুজের ছোপ দেখতে পেয়েছেন। সবুজ রং পরে বাদামী হয়ে যায়। এতে মনে হয় মঙ্গলে গাছপালা জন্মায় ও প্রতি বছর সে সব মরে যায়। তুষার এবং সবুজ ছোপের কথা ভালো করে মনে রাখবে। নামার পর খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে সব কিছু দেখতে হবে। বলা তো যায়না, আমাদের দূর সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনের দেখা পেয়ে পেয়ে পারি।

মঙ্গলগ্রহে চলাফেরায় একটু অসুবিধা হতে পারে। এর মহাকর্ষ বল পৃথিবীর মহাকর্ষ বলের তুলনায় ৪ গুণ কম।

পৃথিবীতে লাফ দিয়ে চার হাত যেতে পারলে ওখানে ১২ হাত যেতে পারবে। ওভাবে চলাফেরার অভ্যাস আমাদের নেই। একটু সাবধানে চলতে হবে আর কি। অক্সিজেন ট্যাঙ্কে মজুদের পরিমাণ বেশি থাকলে এ গ্রহে বেশিদিন থাকা যায়।

বাদবাকী গ্রহে যেতে চাও? তাহলে কল্পযানে জ্বালানীর পরিমাণ দেখে নাও। বৃহস্পতি মঙ্গল থেকে অনেক দূরে। এ গ্রহে যাবে কি-না ভেবে দেখো। গিয়েই যাই যাই করতে পারবেনা। বৃহস্পতিতে টেকা দায়। গ্রহটি অ্যামোনিয়া গ্যাসে ভর্তি। আর এর মহাকর্ষ বল পৃথিবীর তিনগুণ বেশী। তোমার নিজের দেহকে তিনগুণ ভারী মনে হবে। এছাড়া অক্সিজেন ট্যাঙ্ক হেলমেট তো আছেই। গ্রহটি বেজায় ঠাণ্ডা। কল্পযানের যন্ত্রপাতিও জমে যেতে পারে। শেষে না জানি কি বিপদ হয়। এর চেয়ে শনিগ্রহের কথা ভাবা যায়।

শনি বৃহস্পতি থেকে দূরে। সূর্য থেকে গ্রহদের অবস্থান যতো দূরে হবে তাপমাত্রা ততোই কমতে থাকবে। শনির তাপমাত্রা শূন্য ডিগ্রীর নীচে ২০০ ডিগ্রী। অক্সিজেন থাকার প্রশ্নই ওঠে না। গোটা গ্রহ বিষাক্ত গ্যাসে ভরা। তবে, শনিকে দূরে থেকে দেখতে বড়ো সুন্দর দেখায়। চলো, এর চারপাশে ঘুরে দেখি। শনির বাইরে তিনটি বলয় রয়েছে। কোটি কোটি পাথরের খণ্ড জুড়ে বলয়ের সৃষ্টি। এরা মিনি চাঁদের মতো এক জোটে শনির চারপাশে ঘুরছে। এ বলয়ত্রয় ভেদ করে কল্পযানের এগোনো দুঃসাধ্য। থাক। দূরে থেকে দেখা ভালো।

ফেরার আগে ইউরেনাস ও প্লুটোয় যাবার ভাবনা মাথায় আসছে কি? এরা সৌরজগতের প্রান্ত সীমায়। অনেক দূর। ইউরেনাস শনির চেয়ে ঠাণ্ডা। ইউরেনাসের চেয়েও ঠাণ্ডা প্লুটো। এই দুই গ্রহে অক্সিজেন নেই, আলো নেই। কিছু দেখা

যাবেনা। নিঃসীম অন্ধকার। মহাকাশের মতোই আঁধারের রাজ্য। অন্ধকারে পথ হারিয়ে কী বিপদ হয় কে জানে। ফিরে চলাই উত্তম।

প্রতিবেশীদের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা খুব একটা সুখের হলো না। এদের চেয়ে আমাদের পৃথিবী কতো ভালো, কতো সুন্দর। চারদিকে সবুজের সমারোহ। কত বিচিত্র জীব, বিচিত্র গাছ-পালা। অক্সিজেনের জন্য একটু হা-পিত্যেশ করতে হয় না। তাপমাত্রাও জীবের সহ্যসীমায়। পানির জন্য কোনো ভাবনা নেই।

অবশ্য ওদের সম্বন্ধে সব কথা তো জানা হয়নি। দিনে দিনে নতুন নতুন খবর পাওয়া যাবে। এর মধ্যে দু একটি সুখের খবর হতে পারে। তবু প্রতিবেশীর দেশে গিয়ে এক বেলা পেট পুরে খেতে পাবো না, বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারবো না, স্বচ্ছন্দে খেলতেও পারবো না—এটাই বড় দুঃখ।